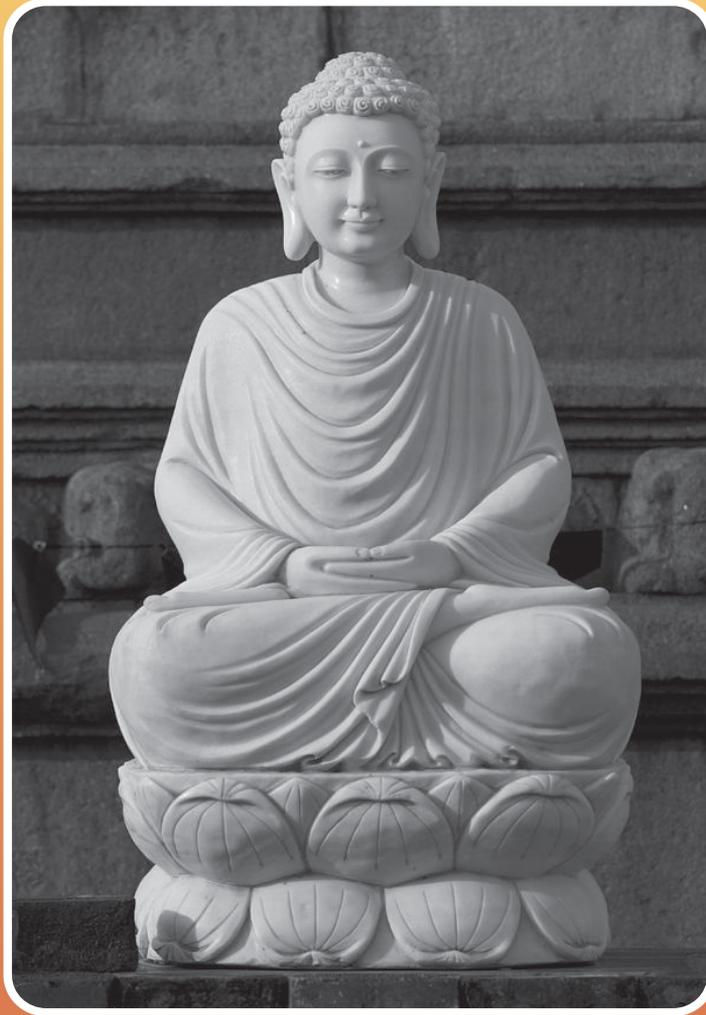


# বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

## ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২  
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪  
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪  
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্য্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী ও জানার ক্ষেত্রকে বাস্তবমুখী করে তুলতে পাঠ্যপুস্তকটিতে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট চিত্র, কাজ ও অনুশীলনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। এর মাধ্যমে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। আশা করা যায়, এই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একইসাথে সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায়ও অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্রান্তিকর অনুষ্ঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানাননীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম	১-১৩
দ্বিতীয়	বন্দনা	১৪-২২
তৃতীয়	শীল	২৩-২৯
চতুর্থ	দান	৩০-৩৭
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৮-৫০
ষষ্ঠ	চতুরার্য সত্য	৫১-৫৬
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৫৭-৬৮
অষ্টম	চরিতমালা	৬৯-৮০
নবম	জাতক	৮১-৮৯
দশম	বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯০-৯৯
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিম্বিসার	১০০-১০৪

## প্রথম অধ্যায়

# গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের অনুসারীদের বৌদ্ধ বলা হয়। আমরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। ছোটবেলা থেকেই জীবের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। ছোট-বড় সকল প্রাণীকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সেবায় ও আদরে অনেক প্রাণী সুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহে গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেমের অনেক কাহিনি পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা —

- \* বুদ্ধের জীবপ্রেম ব্যাখ্যা করতে পারব;
- \* গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেমের কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।

## পাঠ : ১

### গৌতম বুদ্ধের পরিচিতি

খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তুর লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোধন এবং মাতার নাম মহামায়া। তাঁরা শাক্য রাজ্যের রাজা এবং রানি ছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মাতা রানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি রানি মহামায়ার বোন ছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে সিদ্ধার্থের অপর নাম হয় গৌতম। শাক্যরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত।

সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক জ্যোতিষী রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তাঁরা শিশু সিদ্ধার্থের মধ্যে বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘এই রাজকুমার গৃহে থাকলে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন, সন্ন্যাস জীবন ধারণ করলে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।’ কিন্তু একমাত্র ঋষি অসিত বলেন, রাজকুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।

রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং রাজা শুদ্ধোধনের অপরিসীম স্নেহ-মমতায় সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। রাজা রাজকুমারের শিক্ষার জন্য বহু শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত নিয়োগ করেন। তিনি এঁদের নিকট নানা লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। ক্রমে তিনি ঘোড়ায় চড়া, রথচালনা, অসিচালনা, যুদ্ধকৌশল এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখেন। রাজকুমারের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে গুরু বিস্মিত হন। অল্প দিনের মধ্যে রাজকুমার সকল শাস্ত্র ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

রাজকীয় পরিবেশে রাজকুমার ক্রমে কৈশোরে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই রাজকীয় ভোগ-বিলাসে তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে একাকী নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা যেত। রাজকুমারের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা -৬ষ্ঠ, ফর্মা নং-১

ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীনতা দেখে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে অস্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ক্রমে রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনে পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজা লক্ষ্য করলেন, যতই দিন যাচ্ছে কুমার ততই উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি রাজকুমারকে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত রাখার জন্য সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোনো কিছুই রাজকুমারকে আকৃষ্ট করতে পারল না। অবশেষে রাজা অমাত্যদের (মন্ত্রী) সঙ্গে পরামর্শ করেন। অমাত্যগণ রাজকুমারকে সংসারমুখী করার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সপ্তাহব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্য দিয়ে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যশোধরা গোপাদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল হতে সিদ্ধার্থের মনে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, যৌবনে এসে তা আরো বৃদ্ধি পায়। রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। একদা তাঁর নগরভ্রমণের বাসনা হলো। রাজা ঘোষণা করে দিলেন, রাজকুমার নগরভ্রমণে যাবেন, পথ-ঘাট সব যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। নির্দেশ দিলেন, কোনো অসুন্দর দৃশ্য যেন রাজকুমারের দৃষ্টির মধ্যে না পড়ে। রাজার আদেশে রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো। রাজকুমার নগর ভ্রমণে বের হলেন। সাজসজ্জা দেখে রাজকুমারের প্রথম মনে হলো জগতে দুঃখ, বেদনা, হতাশা নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজকুমার দেখলেন, এক জরাজীর্ণ দুর্বল বৃদ্ধ বক্রদেহে লাঠিতে ভর দিয়ে অতিক্রমে পথ চলছে। সিদ্ধার্থ রথচালক ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও কে?’ ছন্দক বললেন, ‘এক বৃদ্ধ’। সিদ্ধার্থ বললেন, ‘সকলেই কি বৃদ্ধ হবে, আমরাও?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘সকলেই বৃদ্ধ হবে। এটাই জগতের নিয়ম।’ ছন্দকের কথা শুনে বিষণ্ণ মনে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হন। দ্বিতীয় দিন দেখতে পেলেন, ব্যাধিগ্রস্ত এক লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সিদ্ধার্থ ছন্দকের নিকট কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এই লোক ব্যাধিগ্রস্ত, সংসারের যে কেউ যে কোনো সময় এ রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

তৃতীয় দিন সিদ্ধার্থ আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন, চারজন লোক একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে একদল লোক ক্রন্দন ও বিলাপ করছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছন্দক বলেন, ‘জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই মৃত্যুর অধীন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

চতুর্থ দিন রাজকুমার পুনরায় নগর ভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন শান্ত, সৌম্য, গেরুয়া বসনধারী মুগ্ধিত মস্তক এক সন্ন্যাসী ধীরগতিতে পথ চলছেন। পরিচয় জানতে চাইলে ছন্দক বলেন, ‘ইনি সংসার ত্যাগী বন্ধনহীন এক মুক্ত পুরুষ। ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে শান্তি অন্বেষণ করছেন।’ ছন্দকের কথা শুনে সিদ্ধার্থ খুশি হন এবং গৃহত্যাগের সংকল্প করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।



সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ যখন সংসার ত্যাগের চিন্তায় অস্থির, তখন খবর এল তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। খবর শুনে তিনি বিচলিত হয়ে বললেন, ‘রাহু জন্মেছে, বন্ধন জন্মেছে।’ তাই পুত্রের নাম রাখা হলো রাহুল। পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দৃঢ় সংকল্প করলেন, ‘আমি আর কালবিলম্ব না করে সকল বন্ধন ছিন্ন করে



গৃহত্যাগের পূর্বে নিদ্রামগ্ন গোপাদেবী ও পুত্র রাহুলকে সিদ্ধার্থের দর্শন

শীঘ্রই বেরিয়ে পড়ব।’ ক্রমে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে উপনীত হন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। রাজ-অন্তঃপুরের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সিদ্ধার্থ বিদায়কালে গোপাদেবী ও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে শেষবারের মতো দেখার জন্য গোপার কক্ষ প্রবেশ করলেন। দেখলেন, গোপা শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। একবার ইচ্ছা হলো শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করবেন। পরক্ষণে ভাবলেন, কোলে তুলে নিলে মা জেগে উঠবেন, তাহলে তাঁর যাওয়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আত্মসংবরণ করে তিনি গোপার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

অতঃপর রথচালক ছন্দককে নির্দেশ দিলেন অশ্ব কন্থককে প্রস্তুত করে নিয়ে আসতে। ছন্দক কন্থককে নিয়ে এলে উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গৃহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকে ‘মহাভিনিষ্ক্রমণ’ বলা হয়। অনোমা নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন, ‘তুমি কন্থককে নিয়ে ফিরে যাও।’ ছন্দক গৌতমকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মন কষ্টে ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রিয় অশ্ব কন্থক শোকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। সিদ্ধার্থ পায়ে হেঁটে বৈশালী নগরে পৌঁছলেন। ঋষি আলাস কালাম, রামপুত্র বুদ্ধকের কাছে যোগ, ধ্যান ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাতে তাঁর মন তৃপ্ত হলো না। সেখান থেকে গেলেন রাজগৃহে। রাজগৃহ থেকে উরুবেলার সেনানী গ্রামে। গ্রামটি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে অশ্বথ গাছের নিচে শুরু করেন কঠোর ধ্যান-সাধনা। ছয় বছর কাটল তাঁর ধ্যান-সাধনায়। অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে



বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে ধর্মপ্রচার করছেন

লাভ করেন বুদ্ধত্ব, জগতে তিনি খ্যাত হন বুদ্ধ নামে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারণাথের ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে অভিহিত। সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তি এবং মজ্জালের জন্য তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী প্রচার করেন এবং আশি বছর বয়সে কুশিনারার শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি নিমিত্ত কী কী? ব্যাখ্যা কর।

## পাঠ : ২

### গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম

বৌদ্ধধর্মে জীবপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের জীবন জীবপ্রেমে সিক্ত। শুধু মানুষ নয়, ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি বুদ্ধের অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল। ‘সকল প্রাণী সুখী হোক’— বৌদ্ধদের অন্যতম কামনা। বুদ্ধের প্রতিটি ধর্মবাণীতে রয়েছে জীবপ্রেমের অমিয় আহ্বান। সকল বৌদ্ধকে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি হচ্ছে — প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এই শীলের মধ্যে শুধু প্রাণীর প্রতি গভীর মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়নি, অধিকন্তু ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষা করার প্রেরণাও রয়েছে। তাই বাঘ, হরিণ, হাতিসহ বনের কোনো প্রাণীই শিকার বা হত্যা করা উচিত নয়। বুদ্ধের জীবপ্রেমের একটি কাহিনি নিচে তুলে ধরা হলো।

### সিদ্ধার্থ ও রাজহংস

বুদ্ধের বাল্যজীবনের ঘটনা। একদিন সিদ্ধার্থ পুষ্প উদ্যানে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় সাদা মেঘখণ্ডের মতো একঝাঁক রাজহাঁস পরম আনন্দে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজহাঁস তীরবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তাঁর সামনে পতিত হয়। শরাহত রাজহাঁসটি মৃত্যুবরণায় ছটফট করছিল। সিদ্ধার্থ পরম যত্নে রাজহাঁসটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাজহাঁসটির শরীর থেকে শর বের করলেন, ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে পরম মমতায় সেবা-সুশ্রুয়া করে রাজহাঁসটিকে সুস্থ করে তুললেন। পরম সুখে রাজহাঁসটির দুচোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হলো এবং সিদ্ধার্থের দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্ত সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন,

‘শরবিদ্ধ রাজহাঁসটি আমার। আমিই তীর নিষ্ক্ষেপ করে রাজহাঁসটিকে ভূমিতে পতিত করেছি। আমার হাঁস আমাকে দাও।’

তখন মমতায় ভরা কণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেন,

‘তাই দেবদত্ত! যে প্রাণরক্ষা করে প্রাণীর ওপর তারই অধিকার। যে প্রাণ হননে উদ্যত হয়, প্রাণীর ওপর তার অধিকার থাকতে পারে না। হাঁসটি মৃত নয়, আহত মাত্র। আমিই সেবা দিয়ে সুস্থ করে হাঁসটির জীবনরক্ষা করেছি। তাই হাঁসটি আমার। আমি এই শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু হাঁসটি দিতে পারব না।’

এরূপ বলে সিদ্ধার্থ হাঁসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন।



তীরবিদ্ধ রাজহাঁসকে কুমার সিদ্ধার্থের সেবা

অনুশীলনমূলক কাজ

আহত রাজহংসটি কার? তোমার মতামত দাও।

পাঠ : ৩

## বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শন

পালি 'মেত্তা' শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে মৈত্রী; যার সমার্থক শব্দ হচ্ছে মিত্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, হিতচিন্তা, পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি। মৈত্রী মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার। এটি হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীত দিক। হিংসা-বিদ্বেষ পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার জন্ম দেয়। মনের মধ্যে হিংসার দাবানল জ্বলে। এতে মানুষের মন হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ংকর হয়। ফলে সে যেকোনো অন্যায়-অবিচার ও প্রাণী হত্যার মতো খারাপ কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মৈত্রী মানুষের মনকে উদার, শান্ত ও ঈর্ষামুক্ত রাখে। মৈত্রী মন থেকে ক্রোধ, হিংসা, হীন প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং অপরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করে। বুদ্ধ বলেছেন, 'মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে, ত্যাগ দ্বারা কৃপণকে জয় করবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।' বুদ্ধ আরো বলেছেন, 'মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল

প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে।’ নিম্নে বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শনের একটি কাহিনি তুলে ধরা হলো।

## সিদ্ধার্থ গৌতম ও ছাগশিশু

গৃহত্যাগের পর একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম রাজগৃহ থেকে বৈশালী যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে এক ছাগশিশুর কবুণ কান্না তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ সময় তিনি ছাগশিশুটি কোলে তুলে নিয়ে রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এদেরকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ।’ রাখাল বলল, ‘এগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে।’

পুত্রসন্তান কামনায় রাজা বিম্বিসার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি ভেরি বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে যত ছাগশিশু আছে, সেগুলো যেন রাজপ্রাসাদে আনা হয়। রাখালের মুখে এ কথা শুনে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, এতগুলো অবোধ প্রাণীর রক্তে প্লাবিত হবে যজ্ঞভূমি। তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। রাজপ্রাসাদের সামনে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের সামনে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠ করছিলেন। ছাগশিশুর কবুণ কান্নায় তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ চাপা পড়ে যায়। এ অবস্থায় কোলে ছাগশিশু নিয়ে মহাযজ্ঞস্থলে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজা আনন্দিত হলেন। রাজা বললেন, ‘আমার কী সৌভাগ্য যে আমার অনুষ্ঠানে নবীন সন্ন্যাসীও অংশগ্রহণ করছেন।’

সিদ্ধার্থ গৌতম চারদিকে একপলক তাকিয়ে রাজাকে বললেন, ‘মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।’ তখন রাজা বললেন, ‘আপনার প্রার্থনা আমাকে বলুন। আমি আপনার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।’

সিদ্ধার্থ গৌতম তখন বললেন, ‘আমি ছাগশিশুর প্রাণভিক্ষা চাই।’ রাজা বললেন, ‘পুত্র লাভের আশায় আমি ধর্মীয় বিধান অনুসারে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি। এখানেসহস্র ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে। আপনি আমার যজ্ঞ নষ্ট করবেন না।’ সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, ‘মহারাজ, আমি আপনার যজ্ঞ নষ্ট করতে চাই না। বিনা রক্তে যদি আপনার দেবতা তুষ্ট না হন তবে এ ছাগশিশুর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। এতে আপনার নরহত্যাজনিত পাপ হবে না। কারণ, আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান করছি।’ গৌতম পুনরায় রাজা বিম্বিসারকে বললেন, ‘মহারাজ শুনুন, ওই ছাগশিশুর কান্না। পশুর পরিবর্তে মানুষ পেলে আপনার দেবতা আরো বেশি তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাকে বলি দিন। এতে যজ্ঞও হবে, ছাগশিশুরাও জীবন ফিরে পাবে।’ এ কথা বলে শ্রমণ গৌতম যূপকাষ্ঠে বন্দী ছাগশিশুকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।



সিদ্ধার্থের জীবনের বিনিময়ে ছাগশিশুর মুক্তি প্রার্থনা

এ দৃশ্য দেখে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে দিলেন। তখন রাজা বিশ্বিসারের মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা বললেন,

‘হে জ্ঞানতাপস! অহংকার ও আভিজাত্যে আমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। আপনি আজ আমাকে সত্যের পথ দেখালেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।’

এ বলে রাজা সকল ছাগশিশু ছেড়ে দিতে এবং যজ্ঞ বন্ধের আদেশ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তখন থেকে রাজা বিশ্বিসার তাঁর রাজ্যে চিরদিনের জন্য পশুবলি বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

অনুশীলনমূলক কাজ  
ছাগশিশুগুলো কীভাবে জীবন ফিরে পেল?

## পাঠ : ৪

### গৌতম বুদ্ধ ও অহিংসা নীতি

বুদ্ধ অহিংসবাদী ছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মকে অহিংসার ধর্ম বলা হয়। অহিংসা শব্দের সাধারণ অর্থ হলো হিংসা না করা। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘অহিংসা’ শব্দটির বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। বৌদ্ধমতে অহিংসা শব্দের অর্থ হলো হিংসা না করা, কায়-মনো বাক্যে হিংসা বর্জন করা, কারো অনিষ্ট না করা, প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, সকল জীবকে রক্ষা করা, মানবতা, কোমলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি প্রদর্শন করা। বুদ্ধ বলেছেন, ‘শুধু নিজেকে ভালোবাসলে হবে না, ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে।’ বুদ্ধ এ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে একটি অহিংসা বিষয়ক কাহিনি তুলে ধরা হলো।

### বৃন্দা মা ও বউ

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে কাত্যায়নী নামে একজন মহিলা বসবাস করতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল খুবই আদরের। তিনি পরম মমতায় তাকে লালন-পালন করেন। মায়ের বয়স হলে ছেলেটিও তাঁর সেবা ও যত্ন করত। মায়ের বিপদ-আপদকে নিজের বিপদ-আপদ মনে করত। বলা যায়, খুব যত্নসহকারে মায়ের দেখাশোনা করত। এভাবে মা ও ছেলে দুজনই সুখে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন মা মনে করলেন, আমি আর কত দিন বাঁচব- এ ভেবে এক সুন্দরী মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরেও ছেলে আগের মতোই তার মায়ের সেবা- যত্ন করতে থাকে। মায়ের প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা দেখে সুন্দরী বউয়ের মনে খুব হিংসা উৎপন্ন হলো। কিন্তু হিংসা স্বামীকে দেখাতে পারত না। এভাবে স্ত্রীর হিংসা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। হিংসাবশত স্বামীর সাথে সে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ করত। একদিন ঝগড়ার সময় স্ত্রী স্বামীকে বলল, ‘তোমার মায়ের সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মাকে চলে যেতে বলো, নতুবা আমি চলে যাব।’

ছেলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য বলল, ‘মা! তুমি আমার স্ত্রীর সাথে রোজই ঝগড়া করো। যদিকে তোমার মন চায় চলে যেতে পারো।’ মনের দুঃখে মা দূরসম্পর্কের একজন আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিন-রাত পরিশ্রম করার বিনিময়ে মা নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেন।

এদিকে বউয়ের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। নাতি হয়েছে শুনে মা খুবই খুশি হলেন। তবে মনে ব্যথা পেলেন। তিনি ভাবলেন : আমার আদরের নাতিকে আমি আজও দেখতে পেলাম না। বিনা অপরাধে আমি ঘরছাড়া। পৃথিবীতে কি ধর্ম বলতে কিছুই নেই? এরূপ বলে মা আক্ষেপ করলেন। মা স্থির করলেন ধর্মপূজা করবেন। খালায় সাজালেন নানাবিধ ফুল, পানি, সুগন্ধি আর প্রদীপ। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র অসহায় মায়ের করুণ অবস্থা দেখলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তিনি উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘বুড়িমা, তুমি কী করছ?’

বুড়িমা উত্তর দিলেন, ‘আমি ধর্মপূজা করছি।’

তখন বুড়িমা ছেলে ও বউয়ের সব কথা খুলে বললেন।

ইন্দ্র বললেন, ‘মা, তুমি দুঃখ করো না। খুব শীঘ্রই তোমার বউ ও ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কারণ তাদেরও একটি ছেলে হয়েছে। তুমি ঘরে যাও। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।’

দেবরাজ ইন্দ্রকে মা ভক্তি সহকারে প্রণাম জানিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁর বউয়ের যে সহিংস মনোভাব ছিল, তা আর নেই। যে ক্রোধ দেখাত, সেগুলো আর নেই। বউয়ের মন দমিত হলো। নিজের হিংসাকে সে প্রশমিত করল। পথের অর্ধেক যেতে না যেতেই মা দেখলেন ছেলে আর বউ নাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি বৃদ্ধ মায়ের কোলে নাতিকে তুলে দিল। ওরা দুজনে বলল ‘মা, দেখ তোমার নাতি’ বউ তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নিজের হিংসা ত্যাগ করে আবার সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

অনুশীলনমূলক কাজ  
‘অহিংসা’ শব্দের অর্থ কী?  
হিংসার কুফল বর্ণনা করো।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুষ্প উদ্যানে রাজহাঁসটিকে খেলার ছলে কে আঘাত করেছিলেন?

- |              |            |
|--------------|------------|
| ক. সিদ্ধার্থ | খ. রাহুল   |
| গ. দেবদত্ত   | ঘ. পুরোহিত |

২. বুদ্ধের অহিংসা নীতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো -

- i জীবের প্রতি মমত্ববোধ
- ii গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন
- iii সকলের প্রতি দয়াপরবশ আচরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন বড়ুয়া ও সুমন বড়ুয়া দু’জন বৈমাত্রেয় ভাই। রিপন বড়ুয়া যথেষ্ট সম্পদশালী হলেও তার ভাই সুমন বড়ুয়া তুলনামূলকভাবে দরিদ্র। এজন্য রিপন বড়ুয়া এবং তার স্ত্রী সুমন বড়ুয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখায় এবং বিরূপ আচরণ করে। তাদের এমন আচরণে সুমন বড়ুয়া অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। প্রতিবেশিরা তাকে প্রতিবাদ করতে বললেও তিনি কোন ঝগড়া বিবাদে না জড়িয়ে বরং ধৈর্য প্রদর্শন করেন, তাদের মঙ্গল চিন্তা করেন।

৩. রিপন বড়ুয়ার আচরণে বুদ্ধনীতির কোন দিকটির ব্যত্যয় ঘটেছে?

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ক. অহিংসা নীতি     | খ. জীবপ্রেম     |
| গ. মৈত্রী প্রদর্শন | ঘ. চারি নিমিত্ত |

### ৪. সুমন বড়ুয়ার আচরণে-

- i. বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে
- ii. রিপন বড়ুয়ার আচরণিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে
- iii. বুদ্ধের অহিংসা নীতির প্রতিফলন ঘটেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় চাকমা আহত এক পথশিশুকে দেখে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তিনি শিশুটির চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং শিশুটিকে সুস্থ করে তুললেন। অপরদিকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র বিমল বড়ুয়া বেশ চঞ্চল এবং রাগী স্বভাবের। প্রায়ই এলাকার ছেলেদের সঙ্গে তার বাগড়া এবং মারামারি হয়। এসব ব্যাপারে তার বাবা মায়ের কাছে অভিযোগ আসে এবং তারা বেশ বিব্রত হন।

- ক. সিদ্ধার্থ চতুর্থ দিন নগর ভ্রমণে গিয়ে কী দেখলেন?
- খ. বৃদ্ধার ছেলে ও বউয়ের মনোভাব কীভাবে পরিবর্তন হলো?
- গ. বিজয় চাকমার আচরণে সিদ্ধার্থের কোন গুণটির বিকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. বিমল বড়ুয়ার আচরণে বুদ্ধের যে গুণটির অভাব রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক সমাজ জীবনে গুণটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

### ২. ঘটনা-১

রতন বড়ুয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভক্তে দেশনা করলেন—‘জগতের সবকিছুই অনিত্য ও দুঃখময়। জন্মের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না।’

### ঘটনা-২

জয় চাকমা রাজবন বিহারে গিয়ে ভিক্ষু-সংঘের পিণ্ডাচরণ দেখে ও সূত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হলেন। নিজের জীবনের পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। একপর্যায়ে সংসারের প্রতি তাঁর অনীহা এল। তিনি মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

- ক. বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম কী লাভ করলেন?
- খ. সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. ঘটনা-১-এর উদ্ভূতাত্মক পাঠ্যবইয়ের চারি নিমিত্তের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. ঘটনা-২-এ জয় চাকমার অনুসৃত পথের ফলাফল ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সিদ্ধার্থকে গৌতম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
২. সিদ্ধার্থ কী কী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন লেখো?
৩. ধর্মচক্র প্রবর্তন কী? বুদ্ধ কোথায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন?
৪. সিদ্ধার্থ ছাগশিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন কেন?
৫. “গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অহিংসবাদী” ব্যাখ্যা করো।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বন্দনা

‘বন্দনা’ বৌদ্ধদের নিত্য পালনীয় একটি কর্ম। বন্দনা হলো গুণরাশি স্মরণ ও অনুকরণ করার প্রক্রিয়াবিশেষ। ধার্মিক, জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তি বন্দনার যোগ্য। মানবচিন্তা সব সময় লোভ-দ্বेष-মোহাদি পাপে লিপ্ত থাকে। বন্দনা মানুষের মনের কালিমা বিদূরিত করে এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। বুদ্ধ বলেছেন, শ্রদ্ধার দ্বারা মহাপ্লাবন অতিক্রম করা যায়। মানবশিশুর বৃদ্ধির জন্য মাতৃদুগ্ধ যেমন খুবই দরকার, তেমনি চিন্তের বিকাশ লাভ করার জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা আবশ্যিক। এ অধ্যায়ে বন্দনার সুফল, নিয়মাবলি, দস্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃ বন্দনা সম্পর্কে পড়ব।



বন্দনারত উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* বন্দনা সম্পর্কে বলতে পারব;
- \* বন্দনা করার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- \* বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

## বন্দনা ও বন্দনার সুফল

## বন্দনা

‘বন্দনা’ শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। যেমন: প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, অভ্যর্থনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তুতিগান ইত্যাদি। মূলত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের গুণরাশির স্তুতি করাই হচ্ছে বন্দনা।

‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। তিনি ছিলেন মানবপুত্র। তাঁকে মহামানব বলা হয়। তাছাড়া তিনি অসীম গুণরাশির অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি। বন্দনার উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের অসীম গুণের স্তুতি বা প্রশংসা করা। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে সুন্দর করা।

আমরা শুধু বুদ্ধকে বন্দনা করি না। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে বন্দনা করি। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান সংঘকেও বন্দনা করি। আমরা বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা করি। সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা করি। বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করি। চৈত্যকে বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানকে বন্দনা করি। মা-বাবার বন্দনা করি। বন্দনা বৌদ্ধদের নিত্যপালনীয় কর্ম।

বন্দনা বৌদ্ধ বিহারে কিংবা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে করা যায়। বিহার যদি বাড়ির কাছে হয়, তাহলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করলে ভালো হয়। আর বিহার যদি দূরে হয়, সে ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা ভালো। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বন্দনা করা মঙ্গল। এ ধরনের বন্দনাকে সমবেত বন্দনা বলা হয়। সমবেত বন্দনার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়। মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়। সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সুদৃঢ় হয়।

## বন্দনার সুফল

মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম। বন্দনার সুফল অনেক। বন্দনার মাধ্যমে মন পবিত্র হয়। পুণ্য লাভ হয়। চিন্তা শুদ্ধ হয়। অশান্ত মন শান্ত ও সংযত হয়। লোভ, দ্বেষ এবং মোহ দূরীভূত হয়। অকুশল ও অন্যায়ে কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত হয় এবং সত্য কথা বলতে উৎসাহী হয়। মনে সং চিন্তা আসে। ভালো কাজে উৎসাহ আসে। ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা জাগে। উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক এবং পরলোকে সুখ লাভ হয়। বন্দনার মাধ্যমে হৃদয়ে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। তাই সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

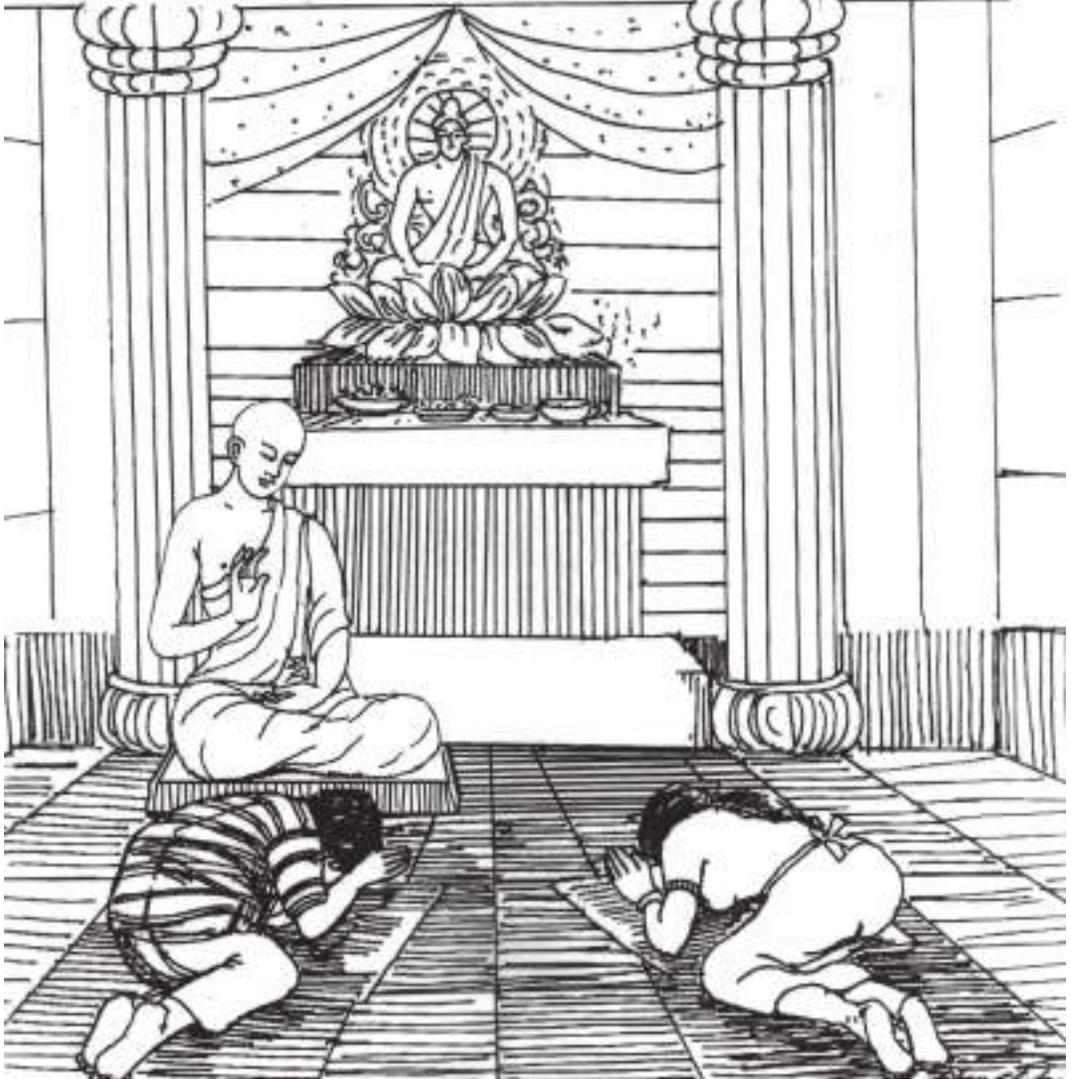
বন্দনা শব্দের অর্থ কী?

বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।

## পাঠ : ২

## বন্দনার নিয়মাবলি

বন্দনা করার আগে এবং বন্দনা করার সময় বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন: বন্দনার আগে ভালো করে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয়। পবিত্র দেহমনে বন্দনা করলে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি কিংবা বুদ্ধের ছবির সামনে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। তারপর দুই হাতের তালু যুক্ত করে মনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনাগাথা আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেক বন্দনাগাথা আবৃত্তি করার পর ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।



বালক-বালিকা বন্দনা নিবেদন করছে

এখন বুদ্ধের দন্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃ বন্দনা শিখবে।

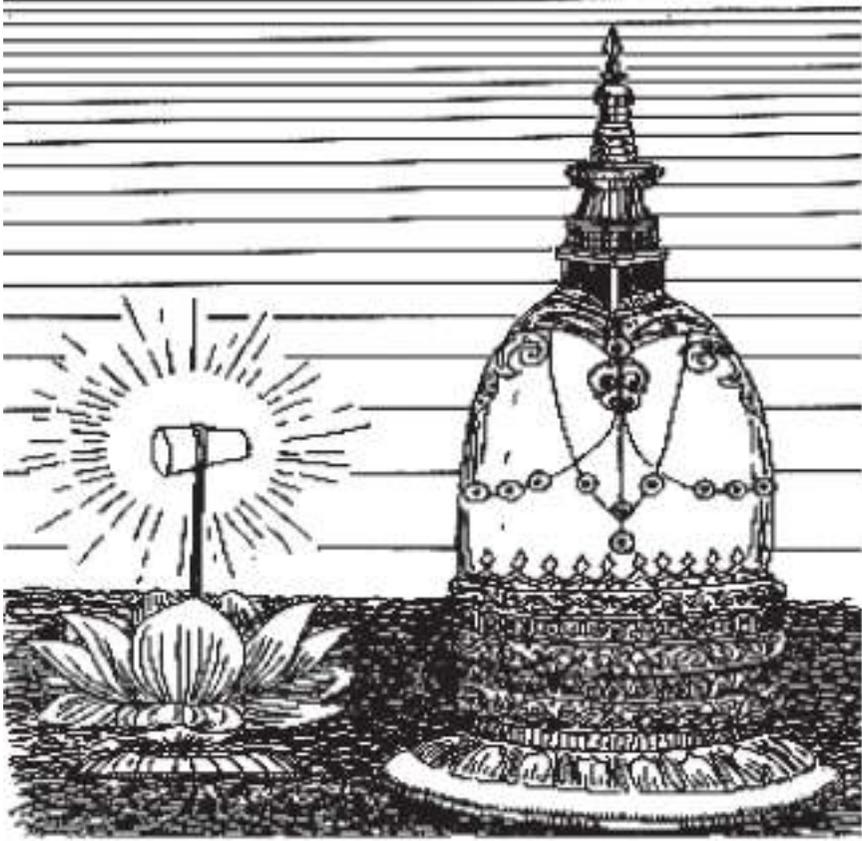
## পাঠ : ৩

## বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা

বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। দন্তধাতু তন্মধ্যে অন্যতম। চারটি স্থানে বুদ্ধের দন্তধাতু যত্নসহকারে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। দন্তধাতু বন্দনার পালি গাথাটি নিম্নরূপ :

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অহু  
একা গান্ধার বিসয়ে, একাসি পুন সীহলে,  
চতসসো তা মহাদাঠা নিব্বান রসদীপিকা  
পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুয়ো।

বাংলা অনুবাদ : বুদ্ধের একটি দন্ত ত্রিদেশপুরে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, একটি সিংহল দ্বীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এ চারটি মহাদন্ত নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত। আমিও সেই চার দন্তধাতুকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করছি।



পাত্রে রক্ষিত বুদ্ধের দন্তধাতু

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনাটি সমবেতভাবে আবৃত্তি কর। (দলীয় কাজ)

## পাঠ : ৪

### সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের পাশে সাতটি স্থানে উনপঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। সেসময় তিনি কখনো ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কখনো পদচারণ করেছেন। কখনো তাঁর উদ্ভাবিত নবধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বোধিবৃক্ষের চারিপাশে এ রকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাতটি স্থানকে সপ্ত মহাস্থান বলা হয়। সপ্ত মহাস্থান হলো :

**বোধিপালঙ্ক :** বুদ্ধ যে আসনে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়।

**অনিমেষ স্থান :** বোধিপালঙ্ক থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে অনিমেষ স্থান অবস্থিত। অনিমেষ স্থানে বসে বুদ্ধ সাত দিন ধরে এক পলকে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য এ স্থান অনিমেষ চৈত্য নামে পরিচিত।

**চক্রমণ স্থান :** বোধিপালঙ্ক ও অনিমেষ স্থানের মাঝখানে যে বেদিটি দেখা যায়, তা চক্রমণ (পদচারণ) স্থান নামে অভিহিত। বুদ্ধ এখানে চক্রমণ করেছিলেন বলে এরূপ নামকরণ হয়।

**রত্নঘর :** বোধিপালঙ্কের সোজা উত্তর-পশ্চিম পাশের সামান্য দূরে রত্নঘর স্থান অবস্থিত। বুদ্ধ এ স্থানে বসেই ধ্যান করেছিলেন।

**অজপাল ন্যাগ্রোধ :** এটি বোধিপালঙ্কের সোজা পূর্বদিকে এবং অনিমেষ স্থানের কিছু দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ছাগল পালকেরা এ বৃক্ষের নিচে বসত বলেই এটি অজপাল বৃক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ এ স্থানে ধ্যান করতেন।

**মুচলিন্দ স্থান :** বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত। এখানে নাগরাজের বসবাস ছিল। মুচলিন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করার সময় নাগরাজ তাঁর দেহ দিয়ে বুদ্ধকে বেষ্টিত করে মশা-মাছি, ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন।

**রাজায়তন স্থান :** বোধিপালঙ্কের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দের উত্তর পাশে এটির অবস্থান। রাজায়তন নামে এক ধরনের পার্বত্য বৃক্ষ ছিল বলেই এটি রাজায়তন স্থান নামে পরিচিত। এখানেও বুদ্ধ সাত দিন যাবৎ ধ্যান করেন।

বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই সপ্ত মহাস্থান বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। তাই বৌদ্ধরা একাগ্রচিত্তে এই সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা নিবেদন করে। সপ্ত মহাস্থান বন্দনাগাথাটি নিম্নরূপ:

পঠমং বোধিপালঙ্কং, দুতিয়ং অনিমিসম্মি চ

ততিয়ং চক্রমণং সেট্ঠং, চতুথং রতনঘরং

পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং

সত্তমং রাজায়তনং, বন্দে তং বোধিপাদপং।

বাংলা অনুবাদ : প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চংক্রমণ স্থান, চতুর্থ রতনঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ  
সাতটি মহাস্থানের নাম লেখ।

পাঠ : ৫

## মাতৃ-পিতৃ বন্দনা

মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম পূজনীয়। মাতা-পিতা না থাকলে আমরা এই অপরূপ পৃথিবীর সৌন্দর্য কখনো দেখতে পেতাম না। স্নেহময়ী মাতা পুত্র-কন্যাদের দশ মাস গর্ভে ধারণ করে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তারপর সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান। পিতা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং পরম মায়ামমতায় লালন-পালন করেন। পিতা-মাতা সব সময় সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনা করেন। এ মহান হিতকামী মাতা-পিতাকে বৌদ্ধরা শ্রদ্ধাচিন্তে বন্দনা জ্ঞাপন করেন। নিচে মাতৃ-পিতৃ বন্দনাগাথা দেওয়া হলো:

### মাতৃ বন্দনা

কত্বান কাযে বুদ্ধিরং খীরং যা সিনেহ পুরিতা  
পায়েত্বা মং সংবড্‌ঢেসি বন্দে তং মম মাতরং।

বাংলা অনুবাদ : যে জননী রক্তসঞ্জাত স্নেহসিক্ত স্তন্য পান করিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেই মমতাময়ী মাতাকে আমি বন্দনা করছি।

### পিতৃ বন্দনা

দযায় পরিপুণ্ণোব জনকো যো পিতা মম  
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তং পিতরং মম।

বাংলা অনুবাদ : দয়ায় পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে ভরণ-পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত করেছেন, সেই পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ  
মাতৃ-পিতৃ বন্দনা আবৃত্তি কর। (দলীয় কাজ)

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

#### ১. 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ক. জ্ঞানী             | খ. মহাজ্ঞানী |
| গ. লৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন | ঘ. মহামানব   |

#### ২. সমবেত বন্দনার প্রভাবে-

- i আত্মীয়তার সম্পর্ক গভীর হয়
- ii মন শান্ত ও পবিত্র হয়
- iii পারলৌকিক পুণ্য লাভ হয়

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

#### নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রতন বড়ুয়া প্রায়ই পরিবার-পরিজন নিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বিহারে গিয়ে প্রথমে বুদ্ধ পূজা করেন। এরপর ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একসাথে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। তবে তার ভাই সুশীল বড়ুয়া বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর উপপঞ্চাশ দিন যে স্থানগুলোতে অবস্থান করেন, সেগুলোর পূজা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#### ৩. রতন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ড কোন ধরনের বন্দনার অন্তর্ভুক্ত?

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ক. একক বন্দনা      | খ. সমবেত বন্দনা         |
| গ. দন্তধাতু বন্দনা | ঘ. সপ্ত মহাস্থান বন্দনা |

#### ৪. সুশীল বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডে-

- i. বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ পায়
- ii. আধ্যাত্মিক ও মানসিক শান্তি লাভ হয়
- iii. পিতা মাতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল হয়

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সৃজনশীল প্রশ্ন



১ম চিত্র



২য় চিত্র

- ক. নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত বুদ্ধের মহাদন্ত ধাতুগুলো কোথায় সংরক্ষিত আছে?  
 খ. 'অনিমেষ স্থান' কী? ব্যাখ্যা করো।  
 গ. ১ম চিত্রের বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।  
 ঘ. ২য় চিত্রে প্রদর্শিত বুদ্ধের অবস্থান সপ্ত মহাস্থানের কোনটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যাপূর্বক বিশ্লেষণ করো।

## ২. দৃশ্যকল্প-১:

প্রত্যয় বড়ুয়া ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানে ফুল তোলে। ফুলগুলো সে তার ঘরে বুদ্ধ মূর্তির সামনে রেখে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সন্ধ্যায় সে বুদ্ধের সম্মুখে মোমবাতি ও ধূপ দিয়ে পূজা করে।

## দৃশ্যকল্প-২:

সৌম্য বড়ুয়া প্রতিদিন নিয়মিত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করে: 'কত্বান কাযে রুধিরং খীরং যা সিনেহ পুরিতা পাযেত্বা মং সংবড্ টেসি বন্দে তং মম মাতরং'।

- ক. বোধিপালঙ্ক কী?  
 খ. মুচলিন্দ স্থান কী? ব্যাখ্যা করো।  
 গ. সৌম্য বড়ুয়ার মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।  
 ঘ. প্রত্যয় বড়ুয়ার কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যাপূর্বক এর ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. বন্দনাকে বৌদ্ধধর্মে 'নিত্যকর্ম' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
২. পরিবারের সদস্য, বন্ধু বাস্বব নিয়ে বন্দনা করা মঙ্গলজনক কেন? ব্যাখ্যা কর।
৩. মাতা-পিতা সন্তান সন্ততির নিকট পরম পূজনীয় কেন?
৪. পিতৃবন্দনা মন্ত্র লিখে বাংলায় অনুবাদ করো।
৫. চংক্রমণ স্থানের নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

# তৃতীয় অধ্যায়

## শীল

বৌদ্ধধর্মে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শীল নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তি। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে গৃহী ও ভিক্ষুদের বিভিন্ন রকম শীল পালনের নির্দেশ আছে। সুন্দর ও পবিত্র জীবন গঠনের জন্য শীল পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা নিত্যপালনীয় শীল, শীল গ্রহণের নিয়মাবলি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* শীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- \* শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- \* বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় পঞ্চশীল বলতে পারব;
- \* পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে নৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ : ১

### শীল পরিচিতি

‘শীল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা চরিত্র। শীলের আরো অর্থ আছে। যেমন : নিয়ম, নীতি, সৎযম, সদাচার, আশ্রয়, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সৎযমকে শীল বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য শীল পালন অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত শীল পালনের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা অনুশীলন করতে পারি। যাঁরা শীল পালন করেন, তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান।

বৌদ্ধধর্মে নানা রকম শীল রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চশীল গৃহীরা পালন করেন। যাঁরা উপোসথ গ্রহণ করেন তাঁরা অষ্টশীল পালন করেন। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমণগণ দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে প্রব্রজ্যাশীল বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘শীল’ শব্দের অর্থ লেখো।

পাঠ : ২

### নিত্যপালনীয় শীল

যে শীলগুলো প্রতিদিন পালন করতে হয়, সেগুলোকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয়। পঞ্চশীল নিত্যপালনীয় শীল। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নেই। সব সময় সর্বত্র পালন করা যায়।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা করলে জন্ম-জন্মান্তরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত এবং হত্যা করা উচিত নয়। প্রথম শীলটি দ্বারা কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা বোঝায় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়। এই শীলটি ছোট-বড়, হীন-উত্তম, দৃশ্য-অদৃশ্য

সকল প্রাণীকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয়টি চুরি বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। চুরি একটি সামাজিক অপরাধও বটে। চুরি করলে সাজা এবং দণ্ড ভোগ করতে হয়। সুনাম নষ্ট হয়। পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। তাই চুরি বা অদত্তবস্তু গ্রহণ করা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেনসিল প্রভৃতি না বলে গ্রহণ করা অনুচিত। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলটি মানুষকে কেবল চুরি বা অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, অধিকন্তু সৎ উপায়ে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত বস্তু বা অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেয়। লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় শীলটি কামাচার বা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই শীলটি মানুষকে অনৈতিক আচার-আচরণ পরিহারপূর্বক নৈতিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়।

চতুর্থ শীলটি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মিথ্যাবাদীকে সকলে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে না। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারা সর্বত্র নিন্দিত হয়। এই শীলটি মানুষকে কর্কশ, অপ্রিয়, অশ্লীল, কটু, অসার কথা, পরনিন্দা এবং সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে কায়, বাক্য এবং মন পরিশুদ্ধ হয়।

পঞ্চম শীলটি সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক, বুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট হয়। মাদক গ্রহণকারী নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত থেকে মানুষের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। মাদক গ্রহণকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তারা ইহকালে যেমন কষ্ট পায়, তেমনি মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। মাদকদ্রব্যের মতো ধূমপানও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সকলের মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

### অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চশীলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শীল ব্যাখ্যা করো।

## পাঠ : ৩

### শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

শীল হচ্ছে সমস্ত কুশল ধর্মের আদি। শীল রক্ষাকবচ। মানবজীবনে শীল অমূল্য সম্পদ। শীল পালন ব্যতীত নিজেকে কখনো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করা যায় না। নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। শীল পালন না করলে বিচার, বিবেচনা ও বুদ্ধি লোপ পায়। নিজের এবং অপরের মজ্জা ও কল্যাণসাধনে শীলের মতো আর কিছুই নেই। শীল পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। মন শান্ত হলে সকল প্রকার অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। এই শীল মানুষকে মহান ও শ্রেষ্ঠ করে তোলে। শীল পালনের মাধ্যমে পরিবারে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সদ্ভাবও সুদৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যা কুশল, সত্য এবং সুন্দর তা সবই শীলে রয়েছে। যাঁরা নিজের জীবনকে মহৎ করে তুলেছেন, তাঁরা সবাই শীল পালন করেছেন। সুতরাং শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

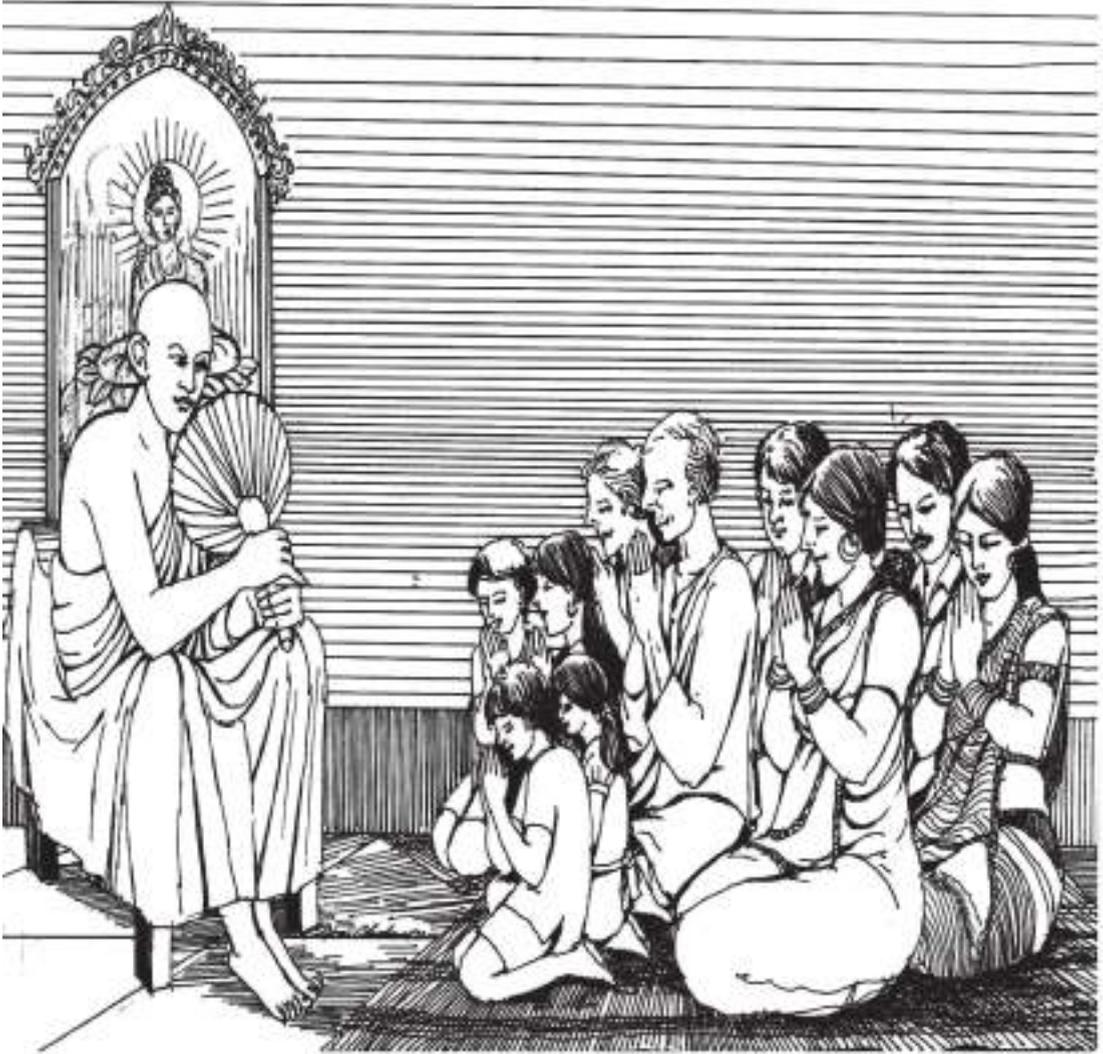
### অনুশীলনমূলক কাজ

শীল মানবজীবনে কী পরিবর্তন সাধন করে?

## পাঠ : ৪

## পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

পঞ্চশীল গ্রহণ করার আগে অবশ্যই মুখ, হাত ও পা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। শান্ত হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়।



বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট করজোড়ে পঞ্চশীল প্রার্থনা

**পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি ও বাংলা)**

পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা গাথাটি এরূপ :

**পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি)**

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিয়ম্পি, ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিয়ম্পি, ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্ত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

**শেখার কৌশল**

১. দুতিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে ।
২. ততিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে ।
৩. একজন প্রার্থনা করলে ‘অহং’ এবং বহুজনে মিলে প্রার্থনা করলে ‘অহং’ এর পরিবর্তে ‘মযং’ বলতে হবে । অনুরূপভাবে, একজন প্রার্থনা করলে ‘যাচামি’, বহুজনে করলে ‘যাচাম’ হবে ।
৪. পালি উচ্চারণের সময় অ-কারন্ত হলে আ-কারন্ত করে উচ্চারণ করতে হয় ।

**বাংলা অনুবাদ**

ভন্তে অবকাশপূর্বক সম্মতি প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি । ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন ।

দ্বিতীয়বার ..... ।

তৃতীয়বার ..... ।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তং বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন) ।

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হঁ্যা ভন্তে বলছি) ।

ভিক্ষু : নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি) ।

শীল গ্রহণকারী : নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (তিনবার বলতে হবে) ।

এরপর ভিক্ষু ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন ।

**ত্রিশরণ**

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি) ।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি (আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি) ।

সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি) ।

দুতিয়ম্পি ..... ।

ততিয়ম্পি ..... ।

ভিক্ষু : সরণা গমনং সম্পন্নং (শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে) ।

শীল প্রার্থনাকারী : আম ভন্তে (হঁ্যা ভন্তে) ।

তারপর ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করবেন এবং শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন ।

## পাঠ : ৫

## পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা)

## পঞ্চশীল (পালি)

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।  
 অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।  
 কামেসু মিচ্ছাচারে বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।  
 মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।  
 সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

## বাংলা অনুবাদ

আমি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।  
 আমি অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।  
 আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।  
 আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।  
 আমি সুরা, মাদক এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

## অনুশীলনমূলক কাজ

পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করে দেখাও। (দলীয় কাজ)  
 ভালো কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।

## পাঠ : ৬

## পঞ্চশীল পালনের সুফল

শীল পালনের সুফল অনেক। যেমন : শীল—

- হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা ও মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।
- মানুষের মনের কালিমা দূর করে।
- মনকে শান্ত ও সংযত করে।
- চরিত্র সুন্দর করে।
- কথা বলায় সংযত করে।
- বিনয়ী ও ভদ্র করে।
- অনৈতিক ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে।

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ফুলের গন্ধ কেবল বাতাসের অনুকূলে যায়, প্রতিকূলে যায় না। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির প্রশংসা বাতাসের অনুকূলে যেমন যায়, তেমনি প্রতিকূলেও যায়। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি অকুশলকর্ম ব্যক্তিজীবনকে কলুষিত করে। কলুষিত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। অপর দিকে শীলবান ব্যক্তি সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন। ফলে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। তাই সকলের শীল পালন ও অনুশীলন করা উচিত।

## অনুশীলনমূলক কাজ

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

#### ১. নিত্যপালনীয় শীল কোনটি?

- |            |             |
|------------|-------------|
| ক. পঞ্চশীল | খ. অষ্টশীল  |
| গ. দশশীল   | ঘ. অর্থাশীল |

#### ২. শীল পালনের মাধ্যমে -

- i. শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করা যায়
- ii. চরিত্র সুন্দর ও পবিত্র করা যায়
- iii. আর্থিক উন্নয়ন করা যায়

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

#### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনুচিং মারমা স্কুলে তার বন্ধুদের ব্যাগ থেকে প্রায়ই না বলে কখনো কলম, কখনো পেনসিল, কখনো খাতা নিয়ে যায়। এতে তার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হয় না। তার সহপাঠী রবিন চাকমা প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে, পাড়ার দুই প্রকৃতির ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে। ইদানিং সে বাবা মায়ের সাথেও খারাপ ব্যবহার করে।

#### ৩. মিনুচিং মারমা পঞ্চশীলের কোন শীলটির নীতি লঙ্ঘন করেছে?

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ক. দ্বিতীয় | খ. তৃতীয় |
| গ. চতুর্থ   | ঘ. পঞ্চম  |

#### ৪. রবিন চাকমার আচরণে তার-

- i শারীরিক ও মানসিক স্থিতি নষ্ট হবে
- ii অল্পবয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা তৈরি হবে
- iii পারলৌকিক মুক্তি মিলবে

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কৃষক রূপক চাকমা কৃষিপণ্য বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করেন। পণ্য বিক্রির সময় তিনি কখনোই ওজনে কম দেয়া বা কোনোরকম ছলচাতুরী, মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নেন না। তার আচরণে গ্রামবাসী মুগ্ধ। অপরদিকে তার প্রতিবেশী সৌমিক বড়ুয়া ধূমপান করেন, গভীর রাতে বেসামাল অবস্থায় বাড়ি ফিরেন। টাকার জন্য বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি সৃষ্টি করেন।

ক. শীল কী?

খ. শীল কেন পালন করতে হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. রূপক চাকমা বৌদ্ধ ধর্মের যে শীল পালন করেন, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৌমিক বড়ুয়ার আচরণে বুদ্ধের কোন নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে? এর ফলাফল কী হতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

২. প্রতিমা বড়ুয়া একজন পূণ্যবতী মহিলা। তিনি তিনি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উপাসনা করেন। তিনি প্রাণি হত্যা, চুরি, অসৎকর্ম, মিথ্যা বলা এবং নেশা ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি অমাবশ্যা, অষ্টমী এবং পূর্ণিমা তিথিতে নিয়ম নীতিগুলো অনুসরণ করে যথাযথভাবে শীল পালন করেন।

ক. বিহার কী?

খ. নিত্যপালনীয় শীলের প্রার্থনা পালি কিংবা বাংলায় লিখো।

গ. প্রতিমা বড়ুয়াকে কোন ধরনের উপাসিকা বলা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রতিমা বড়ুয়া কোন শীল অনুশীলন করেন? তিনি জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ করবেন-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শীল বলতে কী বোঝায়?
২. পঞ্চশীলের প্রথম ও শেষ শীলটি লেখো।
৩. পঞ্চশীলকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয় কেন?
৪. পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখো।
৫. শীল হচ্ছে কুশল কর্মের রক্ষাকবচ-ব্যাখ্যা করো।

## দান

মানুষ যেসব ভালো কাজ করে, তার মধ্যে ‘দান’ অন্যতম। দান বলতে সাধারণত শর্তহীনভাবে অন্যকে কিছু দেওয়া বোঝায়। যেমন, শীতের সময়ে যাদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম কাপড় নেই, তাদেরকে গরম কাপড় বিনামূল্যে দেওয়া। কোনো অসুস্থ মানুষকে প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া একটি শর্তহীন দানের উদাহরণ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু দেওয়ার সময় বিনিময়ে অন্য কিছু আশা করি না, এ রকম দেওয়া বা প্রদান করাকে দান বলা হয়। যিনি দান করেন বা দেন তাঁকে দাতা বলা হয়। আমরা আমাদের চারপাশে অনেককে দান করতে দেখি। দান একটি সেবামূলক কাজ। কারণ, দানের উদ্দেশ্য অন্যের উপকার করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, টাকা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কিডনি, রক্ত, চোখ এমনকি জীবনও দান বা উৎসর্গ করা যায়। এজন্য ‘দান’ একটি মহৎ কর্ম। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ অন্যতম কুশলকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে দানের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ দান সম্পর্কে পড়ব।



গরিব, অসহায় ও শীতর্ত মানুষকে শীতবস্ত্র দান

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* বৌদ্ধধর্মে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- \* বিভিন্ন প্রকার দানীয় বস্তুর বিবরণ দিতে পারব;
- \* দানের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

## বৌদ্ধধর্মে দান

যা দেওয়া হয় তা-ই দান। তবে 'দান' নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন। যিনি দান করবেন তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য কিংবা শীতার্ভ ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করা হয় না। এখানে দাতার কোনো স্বার্থ নেই। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করে থাকি। এরূপ দান নিঃস্বার্থ। আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ, সেবা, রক্ত, আর্থিক সহায়তা দান করি। এখানেও দাতার স্বার্থ থাকে না। বৌদ্ধধর্মে শুধু মানুষের দান নয়, পশু-পাখির দানের কাহিনিও আছে যা বুদ্ধের জীবনী ও জাতক পড়ে জানা যায়। যেমন, বুদ্ধ যখন পারলেয়্য বনে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁকে বানর ও হাতি মধু ও ফল দান করত। দানকর্মের জন্য তারা বৌদ্ধ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, গাছ আমাদের ছায়া দান করে; ফুল অকাতরে সুরভি ও সৌন্দর্য দান করে; নদী তার সুমিষ্ট জল অকৃপণভাবে



ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান

দান করে। পরের জন্য এই অকাতর দান থেকে আমরা দানের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ –এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা শুধু মানুষকে দান করেন না, পশু-পাখি এবং অদৃশ্য প্রাণীদেরও দান করেন। এ ধর্মে মৈত্রী দান করা যায়। ‘মৈত্রী’ হচ্ছে সকলের ভালো হোক এরূপ বন্দনা করা। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দান বৌদ্ধধর্মে দানের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দান শুধু সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। ধনী ব্যক্তি যদি অনেক কিছু দান করেন কিন্তু চিন্তের পবিত্রতা বা মৈত্রীপূর্ণ দানের চেতনা না থাকে, সে দানও যথার্থ হয় না। বিশেষত বৌদ্ধদের দান দেওয়ার সময় দানীয় বস্তু, দাতা ও দান গ্রহীতার গুণাগুণ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিত্ত সম্পত্তি ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

**বস্তু সম্পত্তি** : সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত। এতে বেশি ফল লাভ করা যায়। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু দান করলে তাকে উত্তম দান বলা হয়। তাই সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।

**চিত্ত সম্পত্তি** : দান করার সময় মৈত্রীপূর্ণ কুশল চেতনা নিয়ে দান করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন, চেতনা থেকে উৎপন্ন সৎ কাজই উত্তম কর্ম। লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, মোহ ও সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই চিত্ত সম্পত্তি। এরূপ দানই উত্তম দান।

**প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি** : শীল পালন দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দান ও শীলে প্রতিষ্ঠিত দান গ্রহীতার ওপর দানের সুফল নির্ভর করে। শীলবান দান গ্রহীতা হচ্ছেন দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ দান করার সময় দানের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্রিক গুণসম্পন্ন শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে তা উত্তম দান বলে বিবেচিত হয়। শীলবান গ্রহীতাকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয়।

### দাতার বৈশিষ্ট্য

- ১। দান ও দানফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।
- ২। দানীয় বস্তু ও গ্রহীতার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। দাতার নিজের হাতে দান করা উচিত।
- ৩। কৃপণতা ও অনুরাগ বর্জন করে উদার চিন্তে দান করা উচিত।
- ৪। সঠিক সময়ে উপযুক্ত পাত্রে দান করা উচিত।
- ৫। দানের সময় নিজেকে উত্তম ভেবে গ্রহীতাকে অধম মনে করা উচিত নয়।

দাতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে দাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন—

- ১। দানদাস
- ২। দানসহায়
- ৩। দানপতি

দানদাস : যে দাতা নিজে যা খান তার চেয়ে খারাপ খাবার দান করেন তাকে দানদাস বলা হয়।

দানসহায় : যে দাতা নিজে যেরূপ খান অপরকে সেরূপ দান করেন তাকে দানসহায় বলা হয়।

দানপতি : যে দাতা নিজে সংযম পালন করে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন তিনি দানপতি।

### অনুশীলনমূলক কাজ

দানের বিবেচ্য বিষয় কী কী?

দান করতে হলে দাতার কী কী গুণ থাকতে হবে, উল্লেখ করো।

## পাঠ : ২

## দানীয় বস্তু

ছোট-বড় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধরা দান করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান একক বা যৌথভাবে পালন করা যায়। তবে পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ছাড়াও দান করা যায়। যা দান করা হয়, তাকে বলা হয় দানীয় বস্তু। কী কী দান করা যায় এ বিষয়ে পালি গাথায় দশ রকমের বস্তুর বর্ণনা আছে।

যেমন,

অন্নং পানং বথুং যানং

মালাগন্ধ বিলেপনং

সেয্যা বসথ পদীপেয্যং

দানবথু ইসে দসা।

বাংলা অনুবাদ : অন্ন, জল, বস্ত্র, যানবাহন, মালা বা পুষ্প, সুগন্ধ বা সুরভি, বিলেপন বা শরীর পরিষ্কার করার জিনিস, গৃহ, শয্যাসামগ্রী, প্রদীপ ইত্যাদি উত্তম দানীয় বস্তু। এছাড়া বুদ্ধের জীবনী, জাতক ও নীতিগাথায় দানের কাহিনি বর্ণিত আছে, যা থেকে আমরা দানীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

‘বেসাস্তর’ জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা বেসাস্তর নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব দান করে অবশেষে নিজেকেও দান করেছিলেন। এভাবেই তিনি দান পারমী পূর্ণ করেন। শিবি জাতকে শরীর ও চক্ষু দানের উল্লেখ আছে। দাসী পূর্ণা নিজের খাদ্য পোড়া রুটিখানা শ্রদ্ধাভরে এক শ্রমণকে দান করেছিলেন। ‘কুনাল’ জাতকে পঞ্চপাপা এক শ্রমণকে একতাল মাটিও দান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিন্তে অন্যের উপকার হয়, এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়। বিপদে, দুর্যোগে বিপন্ন ও দুস্থ মানুষকে এমনকি অন্যান্য প্রাণীকেও প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা যায়। ঔষধসহ সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দানীয় বস্তু হতে পারে। তবে দানীয় বস্তু সৎভাবে উপার্জিত হতে হবে। পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি অর্জিত পুণ্যরাশিও বৌদ্ধরা দান করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশনা করার সময় উপাসক ও উপাসিকাদের পুণ্য দান করেন। বৌদ্ধ নর-নারীগণ অর্জিত পুণ্যরাশি জীবিত, মৃত আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু, জানা-অজানা জ্ঞাতিবর্গ, দেবতা ও প্রেতগণ এমনকি শত্রুর উদ্দেশ্যেও দান করেন। বৌদ্ধরা সকল প্রাণির প্রতি ‘সবের সত্তা সুখীতা ভবন্তু’ বলে মৈত্রী দান করেন। আমরা জানি বিদ্যা অমূল্য ‘ধন, বিদ্যা দান করলে তা আরও বাড়ে। বিদ্যার মতো পুণ্যফলও দান করলে ক্ষয় হয় না, আরও বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী দান করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। (দলীয় কাজ)

## পাঠ : ৩

### দান কাহিনি

এখন আমরা বোধিসত্ত্বের একটি দান কাহিনি পড়ব। অনেক অনেক দিন আগে ভরত নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি যথাযথভাবে রাজধর্ম পালন করতেন। প্রজাদের সন্তানস্নেহে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র, পথিক, ভিখারি ও যাচকদের মহাদানে সন্তুষ্ট করতেন। সমুদ্র বিজয়া নামে তাঁর এক পণ্ডিত ও জ্ঞানী রানি ছিলেন। একদিন রাজা তাঁর দানশালা পরিদর্শনের সময় ভাবলেন, ‘আমি যে দান করি, তা অনেক সময় দুঃশীল ও লোভী লোকেরা ভোগ করে থাকে। এতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি শীলবান, উত্তম দানের পাত্র প্রত্যেকবুদ্ধগণকে দান করতে চাই। কিন্তু তাঁরা তো হিমবন্ত প্রদেশে থাকেন। কীভাবে তাদের নিমন্ত্রণ করি?’ তিনি বিষয়টি রানির সঙ্গে আলোচনা করলেন। রানি বললেন, ‘মহারাজ, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা দান, শীল ও সত্য বলে পুষ্প পাঠিয়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে নিমন্ত্রণ করব এবং তাঁরা আগমন করলে অষ্টপরিষকার যুক্ত দান দেব।’ রাজা প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে শীল পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনিও পরিবার পরিজনসহ শীল পালন এবং মহাদান করতে থাকলেন। সোনার পাত্রে ফুল নিয়ে তিনি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। এরপর ভূমিতে পূর্বমুখী হয়ে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করে পূর্ব দিকে যে সকল অর্হৎ আছেন সকলকে প্রণাম করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ থাকলে তাঁদেরকে শিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। এরপর সাত মুষ্টি ফুল নিষ্ক্ষেপ করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ ছিলেন না বলে পরদিন কেউ এলেন না।

এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রত্যেকবুদ্ধদের প্রতি পুষ্প নিষ্ক্ষেপ করলেন। নমস্কার করে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে উত্তর দিকে একইভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তর-হিমালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেকবুদ্ধগণের গুহায় রাজা প্রেরিত পুষ্প পৌঁছে গেল। তাঁদের শরীরে সেই ফুলগুলো পতিত হলো। তাঁরা চিন্তা করে জানতে পারলেন রাজা ভরত তাঁদের নিমন্ত্রণ করছেন। তখন তাঁরা সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধকে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে রাজদ্বারে এসে পৌঁছালেন। রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতি সমাদরে তাঁদের রাজগৃহে নিয়ে গেলেন। অনেক আপ্যায়ন করালেন। অনেক দান করলেন। পরদিনের জন্য আবারও নিমন্ত্রণ করলেন। এভাবে ছয় দিন পর্যন্ত তাঁদের ভোজন ও মহাদান পর্ব শেষে সপ্তম দিনে অষ্টপরিষকার দানের আয়োজন করলেন। অন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি প্রধান ঋষির, তিনি দান অনুমোদন করে এরূপ উপদেশ প্রদান করলেন, ‘দানফলই কেবল আমাদের কাজে আসে। গৃহ, অর্থ সম্পদ, দেহ, বল সবই ক্ষয়যোগ্য।’ অতঃপর ‘অপ্রমত্ত’ হতে উপদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করে চলে গেলেন: ‘যিনি ধার্মিক এবং শীলবান তাঁর দানফল মরণের পরও তাঁকে অনুসরণ করে। অল্প দানেও মহাফল হয়, যদি তা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। উর্বর ভূমিতে চারা রোপণ করলে যেমন উত্তম ফসল পাওয়া যায়, সেরূপ শীলবান ও উত্তম ব্যক্তিকে দান করলে মহাফল অর্জিত হয়। দান প্রশংসনীয় কাজ। দান ও প্রজ্ঞাবলে নির্বাণ লাভ সম্ভব।’

অতঃপর, রাজা ও রানি আজীবন দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন। ঐ রাজা ভরত ছিলেন বোধিসত্ত্ব এবং রানি সমুদ্র বিজয়া ছিলেন গোপাদেবী। এই কাহিনী শেষে গৌতম বুদ্ধ বলেন, ‘জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও বিবেচনা করে দান করতেন।’

## পাঠ : ৪

## দানের সুফল

‘দান’ মানবজীবনের অন্যতম মহৎ গুণ। ছোট-বড় সকল প্রকার দানেরই সুফল আছে। দানের সুফল অনেক। ধর্মগ্রন্থে সেসব সুফলের কথা বর্ণিত আছে। বৌদ্ধরা ধর্মীয়ভাবে যে দান অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও কঠিন চীবরদান উল্লেখযোগ্য। এসব দানের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জিত হয়। দানের মাধ্যমে দাতা অনেক পুণ্যফল অর্জন করেন। ধন ও যশ-খ্যাতি লাভ করেন। সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। দীর্ঘজীবী হন। সর্বত্র প্রশংসিত হন। সকলের প্রিয় হন। অভাব ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না। সুখে জীবন যাপন করেন। চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। তিনি দুর্গতি হতে মুক্তি লাভ করেন এবং সুগতিপ্রাপ্ত হন। এছাড়া, দান পারমী পূর্ণ করার মাধ্যমে দাতা শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই মহাকাব্যিক বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের যথাসাধ্য দান করার উপদেশ দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মে একক দান অপেক্ষা সমবেত দানকে বেশি ফলদায়ক বলা হয়েছে। এ সমবেত দানসমূহ হলো যেমন, সঙ্ঘ দান, অষ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। এগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

## অনুশীলনমূলক কাজ

দানের সুফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

## ১. বৌদ্ধধর্মে অন্যতম কুশলকর্ম কোনটি?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. মৈত্রী | খ. শীল   |
| গ. দান    | ঘ. ধ্যান |

## ২. বৌদ্ধধর্মে দাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- i. উপযুক্ত পাত্রে দান করা
- ii. কৃপণতা পরিহার করা
- iii. সময় বিবেচনা করা

## নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অজয় মারমা একজন সৎ ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা হলো স্বর্গীয় মায়ের জন্য দান করবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষু সজ্জাকে নিমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্যস্তু দান করেন এবং কয়েকজন নিকট আত্মীয়কেও আমন্ত্রণ জানান।

৩. অজয় মারমার দানটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কী বলা হয়?

- ক. পদগলিক দান                      খ. সজ্জাদান  
গ. অষ্টপরিষ্কার দান                      ঘ. কঠিন চীবরদান

৪. এরূপ দানের দ্বারা স্বর্গীয় মায়ের কী উপকার হবে?

- ক. সুগতি লাভ করবে                      খ. মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে  
গ. নির্বাণ লাভ করবে                      ঘ. ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবে

৫. দানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

- ক. নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন                      খ. নিঃস্বার্থ ও শর্তযুক্ত  
গ. বিনিময়যোগ্য                      ঘ. বিনিময়যোগ্য ও ফেরৎযোগ্য

১. বিজলী বড়ুয়া একজন ধার্মিক উপাসিকা। তিনি প্রায়ই ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন গুরু ভক্তকে অষ্টপরিষ্কার দান করবেন। একটি শুভদিনে তিনি দানকার্য সম্পন্ন করেন।

ক. দাতা কাদের কে বলা হয়?

খ. নিঃস্বার্থভাবে দান দেওয়া উচিত কেন?

গ. বিজলী বড়ুয়ার দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিবেচনা করে দান করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বিজলী বড়ুয়ার দানটি মহাফলদায়ক'-বাক্যটি তোমার ভাষায় মূল্যায়ন করো।

### সৃজনশীল প্রশ্ন

২. অমল তালুকদার একজন সেবসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। একদিন মার্গলাভী ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করবেন বলে মনস্থির করলেন। সঞ্চিত অর্থ থেকে একটি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে যথাসময়ে দান করেন। অমল তালুকদারের দান দেখে তার ভাই শ্যামল তালুকদারও পরিবারের অভাব-অনটন দূর করার জন্য এক পুণ্যময় দানীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
  - ক. কোন জাতকে বোধিসত্ত্বের শরীর ও চক্ষুদানের কথা উলেখ আছে?
  - খ. দানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
  - গ. অমল তালুকদারকে কোন ধরনের দাতা বলা যায়? ব্যাখ্যা করো।
  - ঘ. শ্যামল তালুকদারের দানটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বৌদ্ধধর্মীয় আলোকে তোমার মতামত দাও।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দাতা কী?
২. কী কী বস্তু সম্পদ দান করা যায়?
৩. কোন ধরনের দাতাকে দানদাস বলা হয়?
৪. দানের কয়েকটি সুফল লেখ।
৫. কী বলে বৌদ্ধরা প্রাণীর প্রতি মৈত্রি দান করেন?

## পঞ্চম অধ্যায়

# সূত্র ও নীতিগাথা

গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করেছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথায় মঞ্জালকর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে মূলত নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে। এ অধ্যায়ে খুদ্ধকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি, মঞ্জালসূত্র ও দণ্ডবর্গের পটভূমি এবং বিষয়বস্তু পড়ব।



বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে শিষ্যদের সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করছেন

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* খুদ্ধকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান করতে পারব;
- \* মঞ্জালসূত্র বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় বলতে পারব;
- \* মঞ্জাল সূত্রের পটভূমি এবং কীসে মঞ্জাল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- \* দণ্ডবর্গের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব;
- \* দণ্ডবর্গ অনুসারে দণ্ডের পরিণাম মূল্যায়ন করতে পারব।

## পাঠ : ১

## খুদ্ধকপাঠ ও ধর্মপদ পরিচিতি

বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধ দেশিত সূত্রসমূহ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে পাওয়া যায়। খুদ্ধকপাঠ হচ্ছে সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্ধক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। ‘খুদ্ধকপাঠ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত পাঠ। খুদ্ধকপাঠ গ্রন্থে মঙ্গলসূত্র পাওয়া যায়। ধর্মপদ ও খুদ্ধক নিকায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ। ধর্মপদে বুদ্ধ ভাষিত বিভিন্ন গাথা পাওয়া যায়। ধর্মপদের অর্থ সঠিক পথ বা ধর্মের পথ। এ গ্রন্থের গাথাগুলো মানুষকে ধর্মের পথে বা সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই এ গ্রন্থের নাম ধর্মপদ। ধর্মপদে ২৬টি অধ্যায়ে ৪২৩টি গাথা আছে। এ অধ্যায়ে আমরা খুদ্ধকপাঠের ‘মঙ্গলসূত্র’ এবং ধর্মপদের ‘দণ্ডবর্গ’ পড়ব।

অনুশীলনমূলক কাজ  
ধর্মপদের পরিচয় দাও।

## পাঠ : ২

## মঙ্গলসূত্রের পটভূমি

মঙ্গল শব্দের অর্থ শুভ বা ভালো। আমরা নিজের ও অন্যের শুভ বা ভালো হোক কামনা করে থাকি। একে মঙ্গল কামনা বলে। অনেক সময়ই মনে প্রশ্ন জাগে, আসলে কীসে বা কী করলে মঙ্গল হয়? মানুষ নানা রকম আচরণ বা চিহ্নকে মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক মনে করে থাকে। যেমন, কোনো কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেকে ডান পা আগে বাইরে দেওয়াকে মঙ্গল মনে করে। অনেকে ভরা কলসসহ মেয়ে দেখলে মঙ্গল বা শুভ হয় বলে মনে করে। অনেকে কাক ডাকলে অশুভ হয় মনে করে ইত্যাদি।

গৌতম বুদ্ধের সময়েও লোকেরা কীসে মঙ্গল হয় তা নিয়ে আলোচনা করত। কেউ বলত, ভালো কিছু দেখলে মঙ্গল হয়। কেউ বলত, দেখার মধ্যে মঙ্গল নেই, শোনার মধ্যেই মঙ্গল। আবার, কেউ বলত, শোনার মধ্যে মঙ্গল নেই, মঙ্গল আছে ঘ্রাণ নেওয়ার মধ্যে, স্বাদ নেওয়ার মধ্যে কিংবা স্পর্শ করার মধ্যে। এভাবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও মঙ্গল নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতো। কিন্তু এতে কোনো সমাধান হলো না। তখন তাবতিংশ স্বর্গের দেবতারা একত্র হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের কথা শুনে একজন দেবপুত্রকে মর্ত্যলোকে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। দেবপুত্রসহ অন্য দেবতারা বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে মঙ্গল কী জানতে চাইলেন। তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের উপকারের জন্য মঙ্গলসূত্র দেশনা করেন। তিনি মঙ্গলসূত্রে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের কথা বলেন। এভাবেই ‘মঙ্গলসূত্রের’ উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বুদ্ধ কেন মঙ্গলসূত্র দেশনা করেছিলেন?

## পাঠ : ৩

## মঞ্জলসূত্র (পালি ও বাংলা)

১. বহুদেবা মনুসসা চ, মঞ্জলানি অচিন্তয়ুং

আকঙ্খমানা সোথানং ব্রুহি মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : বহু দেবতা ও মানুষ স্বস্তি কামনা করে কীসে মঞ্জল হয় তা চিন্তা করেছিলেন । কিন্তু কীসে মঞ্জল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি । আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মঞ্জলসমূহ ব্যক্ত করুন ।

২. অসেবনা চ বালানং, পত্তিতানঞ্চ সেবনা,

পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : মূর্খ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঞ্জল ।

৩. পতিরূপ দেসবাসো চ, পুবে চ কতপুএংএতা,

অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : (ধর্মমত পালনের উপযোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা এবং নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঞ্জল ।

৪. বাহু সচ্চঞ্চ সিন্ধঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,

সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মঞ্জল ।

৫. মাতাপিতু উপট্টানং, পুত্রাদারস্ সঙ্গহো,

অনাকুলা চ কস্মত্তা, এতং মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : মাতা ও পিতার সেবা করা, স্ত্রী ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঞ্জল ।

৬. দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, এগাতকানঞ্চ সঙ্গহো,

অনবজ্জানি কস্মানি, এতং মঞ্জলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং সদ্ধর্মে অপ্রমত্ত থাকা উত্তম মঞ্জল ।

৭. আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সৎসংমো,  
অপ্লমাদো চ ধম্মেসু, এতং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : কায়িক ও মানসিক পাপকাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মদ্যপানে বিরত থাকা এবং অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মজ্জল ।
৮. গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্টী চ কতৎসুত্তো,  
কালেন ধম্মসবণং, এতং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মজ্জল ।
৯. খন্তী চ সোবচসস্তা, সমণানঞ্চ দস্সনং,  
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালন করা, শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মজ্জল ।
১০. তপো চ ব্রহ্মচারিযঞ্চ চ, অরিয়সচ্চান দস্সনং,  
নিব্বানং সচ্ছিকিরিষা চ, এতং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : তপশ্চর্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চারি আর্য়সত্য হৃদয়জাম করা এবং পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মজ্জল ।
১১. ফুট্টস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পতি,  
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, লোভ, দ্বেষ ও মোহের মতো কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপদ থাকা উত্তম মজ্জল ।
১২. এতাদিসানি কত্ত্বান, সব্বথমপরাজিতা,  
সব্বথ সোথিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মজ্জলমুত্তমং ।  
বাংলা অনুবাদ : এসব মজ্জলকর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকা যায় - এগুলো তাঁদের (দেব-মनुষ্যের) উত্তম মজ্জল ।

### অনুশীলনমূলক কাজ

মজ্জলসূত্রটি শুদ্ধ উচ্চারণে সমস্বরে আবৃত্তি করো। (দলীয় কাজ)

মজ্জলসূত্রে বর্ণিত মজ্জলসমূহের তালিকা প্রস্তুত করো। (দলীয়ভাবে)

## পাঠ : ৪

## মজ্জল সাধনের উপায়

মজ্জলসূত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মজ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করেছেন। সূত্রটি পাঠ করলে দেখা যায়, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশ সাধনে মজ্জলসূত্রের উপদেশসমূহের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মজ্জলসূত্রের প্রতিটি উপদেশে মজ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

সূত্রে বলা আছে, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করতে হবে, মুর্থ লোককে সেবা করা যাবে না। পূজনীয় ব্যক্তির সেবা করলে মজ্জল সাধিত হয়। সন্দর্ভ আচরণ করা যায় এমন দেশে বসবাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে দেশে সংভাবে জীবনযাপন করা যায়, সে দেশে বসবাস করলে মজ্জল সাধিত হয়।

নানারূপ শাস্ত্র ও বিদ্যা অর্জন করে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বড় গুণ বিনয় ও ভদ্রতা। মজ্জলসূত্রে বিনয়ী হতে ও সুভাষিত বাক্য বলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ নির্দেশনা মেনে চললে মজ্জল সাধিত হয়।

মাতা-পিতা সন্তানদের অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেন। মাতা-পিতার কারণেই আমরা পৃথিবীর আলো দেখি। বিবেকসম্পন্ন মানুষমাত্রই মাতা-পিতার সেবা করা পবিত্র কর্তব্য। স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হয়। এতে মজ্জল সাধিত হয়।

সৎ ব্যবসা ও চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে মজ্জল সাধিত হয়। দান করা, ধর্মাচরণ করা, আত্মীয়-পরিজনের উপকার করা এবং ধর্ম পালনে অবিচল থাকলে মজ্জল সাধিত হয়।

কায়িক ও মানসিক পাপকাজ হতে বিরত থাকতে হবে। মাদক সেবন না করে অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মজ্জল সাধিত হয়।

গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁদের যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করা, নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করলে মজ্জল সাধিত হয়।

ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ, সকলকে ক্ষমাশীল হতে হবে। গুরু বা শিক্ষকের নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে।

শ্রমণদের দর্শন ও যথাসময়ে ধর্মালোচনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মজ্জল সাধিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ। কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যই মজ্জলসূত্রে তপস্যা, ব্রহ্মচার্য পালন ও চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে মজ্জল সাধিত হয়।

ইহজাগতিক লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচল থাকতে পারলে মজ্জল সাধিত হয়। শোক, পরিতাপ, লোভ, ঘেঁষ, মোহ — এ সবই ক্ষতিকর। এসব থেকে মুক্ত হতে পারলে মজ্জল সাধিত হয়।

উল্লিখিত কুশলকর্ম জীবনে অনুশীলন করলে মানুষের মজ্জল সাধিত হয়। মজ্জলসূত্রের প্রতিটি নির্দেশনা মানব জীবনে অনুসরণযোগ্য। এই নির্দেশনাসমূহ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি ও সমাজের মজ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

মজ্জল সাধিত হয় এমন চারটি কর্মের দৃষ্টান্ত দাও।

## পাঠ : ৫

## দণ্ডবর্গের পটভূমি

‘দণ্ড’ অর্থ শাস্তি। অন্যায় বা অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধ করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু শাস্তি অনেক সময় অপরাধের পরিমাণ না কমিয়ে আরও অপরাধ করার ইচ্ছা জাগায়। আবার ভুল করে নিরাপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেলে আরও অন্যায় হয় এবং মনঃকষ্ট বৃদ্ধি পায়। দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট ভোগ করতে হয়। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি চরম সিদ্ধান্ত। যিনি দণ্ড প্রদান করেন তিনি বিচারক। তাঁকে জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক কিছু বিবেচনা করে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করে থাকেন। দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের দশম অধ্যায়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধের বর্ণিত এই ধর্মপোদেশ ‘দণ্ডবর্গ’ নামে অভিহিত। এ বর্গে বুদ্ধ দণ্ডের প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তিনি শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তিভোগকারীর কষ্ট ও মনোবেদনা উপলক্ষি করার কথা বলেছেন। শাস্তির জন্য শাস্তি প্রদান নয় বরং চিন্তাশুদ্ধি আনয়ন করতে পারলে অন্যায় অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। হত্যার বদলে হত্যা, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত কখনো শাস্তি আনতে পারে না। একসময় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করেন। তখন দুজন ভিক্ষুর মধ্যে উপবেশন ও শয়ন নিয়ে বিরোধ বা মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তা নিরসন বা মীমাংসা করার লক্ষ্যে বুদ্ধ দণ্ড বর্গের ভাষিত গাথাগুলো দেশনা করেন। এটাই দণ্ডবর্গের মূল উৎস বা উৎপত্তির কারণ।

## পাঠ : ৬

## দণ্ডবর্গ (পালি ও বাংলা)

## দণ্ডবর্গ (পালি)

১. সৰ্বে তসন্তি দণ্ডস্ সৰ্বে ভাযন্তি মচ্চুনো,

অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেয্য ন ঘাতযে।

বাংলা অনুবাদ : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা করো না।

২. সৰ্বে তসন্তি দণ্ডস্ সৰ্বেসং জীবিতং পিয়ং

অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেয্য ন ঘাতযে।

বাংলা অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত করো না।

৩. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,

অন্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যে সুখপ্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, পরলোকে সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না।

৪. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন হিংসতি,  
অন্তনো সুখমেসানো পেচ্ছ সে লভতে সুখং ।  
বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না, পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন ।
৫. মা' বোচ ফরুসং কঞ্চি বৃত্তা পটিবদেয়্যু তং,  
দুচ্ছাহি সারম্ভকথা পটিদগ্গা ফুসেয়্যু তং ।  
বাংলা অনুবাদ : কাউকে কটু কথা বলবে না । যাকে কটু কথা বলবে, সে-ও তোমাকে কটু কথা বলতে পারে । ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সেজন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে ।
৬. সচে নেরেসি অন্তানং কংসো উপহতো যথা,  
এস পত্তো'সি নিব্বানং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি ।  
বাংলা অনুবাদ : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পারো, তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে, ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না ।
৭. যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং  
এবং জরা চ মচ্ছু চ আয়ুং পাচেত্তি পাণিনং ।  
বাংলা অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণভূমিতে নিয়ে যায়, সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ।
৮. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্জতি,  
সে হি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদড্ঢো'ব তপ্পতি ।  
বাংলা অনুবাদ : নির্বোধ লোক পাপকাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং দুর্ঘট লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো যত্নগা ভোগ করে ।
৯. যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্টেসু দুস্সতি,  
দসন্নমএৎতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি ।  
বাংলা অনুবাদ : অদণ্ডনীয় (নির্দোষ) ও নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি সহসা দশবিধ অবস্থার মধ্যে অন্যতর (অবস্থা) লাভ করে ।
১০. বেদনং ফরুসং জানিৎ সরীরস্ স চ ভেদনং,  
গরুকং বা'পি আবাধং চিত্তক্খেপং'ব পাপুণে ।  
বাংলা অনুবাদ : (তার) তীব্র বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, শরীরের অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিত্তবিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় ।

১১. রাজতো বা উপস্‌স্‌গ্‌গং অব্‌ভক্‌খানং'ব দারুণং  
পরিক্‌খয়ং'ব এগ্‌তীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গুরং ।

বাংলা অনুবাদ : (সে) রাজরোষ বা দারুণ অপবাদের সম্মুখীন হয়, (তার) জ্ঞাতিক্ষয় হয় এবং সম্পদ নাশ হয় ।

১২. অথব'স্‌স অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো,  
কায়স্‌স ভেদা দুপ্পএঃএগ্‌ নিরয়ং সো'প্পজ্জতি ।

বাংলা অনুবাদ : (তার) ঘর আগুনে পুড়ে যায়, মৃত্যুর পর সে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হয় ।

১৩. ন নগ্‌গচরিয়া ন জটা ন পক্ষা, নানাসকা থন্ডিলসায়িকা বা,  
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং, সোধেত্তি মচ্চং অবিতিল্লক্‌খং ।

বাংলা অনুবাদ: নগ্নচর্যা, জটাধারণ, কাদালেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিতে শয়ন, ধূলি বা ছাইমাখা, কঠিন উৎকট তপস্যায় নিজেকে পীড়ন করা, এসব জপতপ কিছুতেই সংশয়ভরা মানুষকে পবিত্র করতে পারে না ।

১৪. অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য, সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,  
সবেবসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং, সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্‌খু ।

বাংলা অনুবাদ : অলংকৃত হয়েও যিনি শাস্ত, দমিত ও সব সময় ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাহীন হয়ে শান্তিময় আচরণ করেন-তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু ।

১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,  
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্‌সো ভদ্রো কসামিব ।

বাংলা অনুবাদ : সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন কশাঘাতকে এড়িয়ে চলে, সেইরূপ লজ্জাবোধে নিন্দনীয় কাজ এড়িয়ে চলেন এমন লোক কয়জন আছেন?

১৬. অস্‌সো যথাভদ্রো কসানিবিট্‌ঠো, আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,  
সদ্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ, সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ;  
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্‌সতা, পহস্‌সথ দুক্‌খমিদং অনপ্পকং ।

বাংলা অনুবাদ : বেতের আঘাতে ভদ্র (সুশিক্ষিত) ঘোড়া যেমন বেগবান হয়, সেরূপ তোমরা শক্তিমান ও বেগযুক্ত হও । শ্রদ্ধা, শীল, শৌর্য, সমাধি ও ধর্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে অপরিমেয় দুঃখরাশি হতে মুক্ত হও ।

১৭. উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নমযন্তি তেজনং,  
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা, অন্তানং দমযন্তি সুবত্তা ।  
বাংলা অনুবাদ : জল সেচনকারী যেমন জলকে ইচ্ছামতো চালিত করেন, শর-নির্মাতা যেমন শরকে সোজা করেন, কাঠমিস্ত্রি (তক্ষক) যেমন কাঠের টুকরাকে ইচ্ছামতো আকার দান করেন, ব্রতচারী ব্যক্তিও তেমনি নিজেকে দমন করেন ।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বিতর্ক অনুষ্ঠান  
বিষয় : হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় ।

## পাঠ : ৭

### দণ্ডের পরিণাম

জীবন সকলেরই প্রিয় । জগতের সকল প্রাণী মৃত্যু ও দণ্ডকে ভয় পায় । তাই অপরকে নিজের মতো ভেবে কাউকে আঘাত করা উচিত নয় । নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দুর্মতি পরায়ণ ব্যক্তি অপরকে দণ্ড দ্বারা আঘাত ও হত্যা করে । কিন্তু দণ্ড প্রয়োগে প্রকৃত সুখ অর্জন করা যায় না । দণ্ডের পরিণাম ভয়াবহ । এতে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায় । নিরাপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ গুরুতর অপরাধ এবং পাপও বটে । যে দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি নিরাপরাধ ব্যক্তি, কল্যাণ মিত্র বা সাধু ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ করে বা মিথ্যা নিন্দা আরোপ করে, পরিণামস্বরূপ সে দশবিধ দুঃখজনক অবস্থার অন্যতম অবস্থাপ্রাপ্ত হয় । যথা : ১) সে শিরঃপীড়া, শূলরোগ প্রভৃতি দ্বারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে; ২) তার স্বীয় শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয় হয়; ৩) তার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়; ৪) তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চক্ষুহানি, মেরুদণ্ড বিকৃতি, কুষ্ঠ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়; ৫) সে উন্মাদ, রোগগ্রস্ত হয়; ৬) তাকে রাজাপরাধী সাব্যস্ত করে রাজকর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়; ৭) সে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জড়িত হয়ে নিদারুণ কলঙ্কের ভাগী হয়; ৮) তার আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিয়োগ হয়; ৯) তার সম্বিগত ধন-সম্পদ নষ্ট হয় এবং ১০) তার গৃহ আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয় ।

এই ভয়াবহ পরিণাম হতে রক্ষা পেতে হলে দণ্ড ত্যাগ করে মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত । বুদ্ধ বলেছেন, শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয় না । মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয় । যিনি নিজের সুখের জন্য অপর সুখকাতর জীবের প্রতি হিংসা করেন না, দণ্ড প্রয়োগ করেন না, তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে পরিশেষে পরম নির্বাণসুখ লাভ করেন । তাই সকলের দণ্ড ত্যাগ করা উচিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ  
দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা করো ।

## পাঠ : ৮

## মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষা

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মঙ্গলসূত্রে মানুষকে জ্ঞানী লোকের সেবা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানী লোককে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনা মানতে হবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করতে বলা হয়েছে। ভালো কাজের কথা স্মরণ করে নিজে সঠিক পথে পরিচালিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে বিদ্যা অর্জন, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে, যাতে কেউ কষ্ট না পায়। মাতা-পিতা গুরুজনের সেবা করতে হবে। স্ত্রী-পুত্রের উপকার করতে হবে। সৎ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। দান-কর্ম ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে হবে। সন্দ্বর্মে অবিচল থাকতে হবে। শারীরিক বা মানসিক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। কীর্তিমান সফল ব্যক্তিদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করতে হবে। যথাসময়ে ধর্মকথা শুনতে হবে। ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে। ধৈর্য ও প্রতিপদ বাক্য চর্চা করতে হবে। ভিক্ষু-শ্রমণ দর্শন ও ধর্ম আলোচনা করতে হবে। ধ্যান, সমাধি ও চারি আর্ষসত্য অনুধাবন করতে হবে। নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে হবে। লাভ-ক্ষতি, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিন্দা বা প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্বক্ষেত্রেই চিত্তকে স্থির রাখা, শোক না করা, লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকার অনুশীলন করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এ সকল মেনে জীবনযাপন করে, তাঁরা সব সময় সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারে। মঙ্গলসূত্রে বুদ্ধ এ সমস্ত কাজকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলেছেন। মঙ্গলসূত্রে ওপরে বর্ণিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

দণ্ডবর্গ পাঠেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করা যায়। দণ্ডবর্গ হতে আমরা শিক্ষা পাই যে দণ্ড প্রয়োগ বা শাস্তি দ্বারা অন্যায় প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। অন্যায়কারীকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারলেই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব। কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তির পরিণাম বিবেচনা করতে হয়। অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না। প্রচলিত আইনে অপরাধীর জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা প্রয়োগে কর্তৃপক্ষকে খুবই সতর্ক হতে হবে। কারণ বলা আছে, ভুল বিচারে একাধিক দোষী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজনও নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন বিনা দোষে শাস্তি না পায়। দণ্ডবর্গে প্রতিহিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারো প্রতি কটুকথা, ক্রোধপূর্ণ বাক্য বা প্রতিদণ্ড প্রদান করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে ইহজগতে এবং পরজন্মে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধু করা সম্ভব। কারও প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিহিংসাবশত দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। আত্মসংযম, সহনশীলতা, মৈত্রী ও ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত।

দণ্ডবর্গ অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে শাস্তি প্রদানের পরিণাম অনুধাবন করতে শিক্ষা দেয়।

## অনুশীলনমূলক কাজ

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন:

#### ১. বৌদ্ধধর্মের পরম লক্ষ্য কোনটি?

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ক. মানুষের মঙ্গল সাধন | খ. নির্বাণ লাভ       |
| গ. ক্ষমাশীল হওয়া     | ঘ. পুণ্যকর্ম সম্পাদন |

#### ২. ‘মাতাপিতৃ উপট্ ঠানং’ বলতে বোঝায়-

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ক. জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর সেবা করা | খ. ভ্রাতার লোকের উপকার করা  |
| গ. ধর্ম কর্ম পালন করা              | ঘ. বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া |

### নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব অরিন্দম একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সারাদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। কখনো নানারকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, কখনোবা প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি হয়। এ অবস্থায় তিনি এমন গ্রন্থ পাঠ করেন যা বুদ্ধ দেশিত সূত্র পিটকের অর্ন্তগত প্রথম গ্রন্থ। অরিন্দম তাছাড়াও অরিন্দম সুযোগ পেলেই পিতামাতা, শিক্ষক, গুরুজনদের খোঁজ খবর নেন এবং সাধ্যমতো তাদের সেবা করেন।

#### ৩. জনাব অরিন্দমের পাঠকৃত গ্রন্থ কোনটি?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. খুদ্ধক পাঠ | খ. ধর্মপদ     |
| গ. দম্ভবর্গ   | ঘ. মঙ্গলসূত্র |

#### ৪. জনাব অরিন্দমের মতো কর্মকান্ড অনুসরণে-

- i. মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে
- ii. পারিবারিক এবং সামাজিক শান্তি নষ্ট হয়
- iii. নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

## ১. ঘটনা -১:

গৃধ্র জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখশোনা করতেন। তাঁরা এক পর্বতের ওপর শকুনদের নির্জন গুহায় থাকতেন। বোধিসত্ত্ব বারানসির শ্বাশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা-বাবাকে খাওয়াতেন।

## ঘটনা-২:

মিলির মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, বাড়ির উঠানে একটি মাত্র শালিক পাখি ঘোরাঘুরি করছে। এটি দেখে মিলির মায়ের অত্যন্ত মন খারাপ হলো। অজানা বিপদের আশংকায় তার অন্তর কেঁপে উঠলো।

ক. বুদ্ধ দেশিত সূত্রসমূহ কোথায় পাওয়া যায়?

খ. বিচারককে জ্ঞানী হতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. ঘটনা-১ এর সাথে মঙ্গলসূত্রের কোন শ্লোকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মিলির মায়ের আশংকা যৌক্তিক কী না? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. অনুচ্ছেদ-১: রাজু বড়ুয়ার চাকুরির ক্ষেত্রে সৎ কর্মকর্তা হিসেবে অনেক সুনাম রয়েছে। তার কয়েকজন সহকর্মী দায়িত্ব পালনকালে অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ব্যাপারটি উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। কিন্তু এসব অপকর্মের জন্য সহকর্মীরা উল্টো রাজু বড়ুয়াকেই দোষারোপ করেন এবং অন্যায়ভাবে তাকে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করেন।

অনুচ্ছেদ-২: ‘হে প্রিয়, তুমি যদি কারো প্রতি ক্ষুব্ধ হও, কেউ যদি তোমাকে রুষ্ট করে, মৈত্রী ও শান্তির বাণী উচ্চারণ করো, সহসা তোমার রাগ থেমে যাবে’।

ক. ‘খুদ্ধক পাঠ’ শব্দের অর্থ কী?

খ. দেবতার বুদ্ধের কাছে কেন গিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লিখো।

গ. রাজু বড়ুয়ার সহকর্মীদের পরিণাম কী হতে পারে? দণ্ডবর্গের শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদ-২ এর সাথে কোন সূত্র বা শিক্ষণীয় বিষয়ের মিল রয়েছে? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:**

১. 'ধর্মপদ' নামকরণ কীভাবে হলো? ব্যাখ্যা করো।
২. মাতাপিতৃ উপট্ঠান, পুত্তাদারসস্ সজ্জাহো, অনাকুলা চ কম্মত্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং-বাংলায় অনুবাদ করো।
৩. কাদের অনুরোধে এবং কোথায় বুদ্ধ মঙ্গল সূত্র দেশনা করেন?
৪. দণ্ডবর্গের উৎপত্তির কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।
৫. বৌদ্ধধর্মের আলোকে মঙ্গল সাধনের উপায় ব্যাখ্যা করো।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# চতুরার্য সত্য

একদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। তারপর ছয় বছর তপস্যার ফলে লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। একে বৌদ্ধ পরিভাষায় চতুরার্য সত্য বলা হয়। চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম চতুরার্য সত্য দেশনা করেন। চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। এ সত্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ সম্ভব। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি চতুরার্য সত্য সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- \* চতুরার্য সত্যের ধারণা দিতে পারব;
- \* দুঃখসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- \* দুঃখের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- \* চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

### চতুরার্য সত্য পরিচিতি

চতুরার্য সত্য বুদ্ধের অনন্য উপলব্ধি। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ে নানা অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তরুণ বয়সে সিদ্ধার্থ নগর দর্শনে বের হলে ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে দেখেন। একদল লোককে শোক করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখেন। জীবনের এরূপ পরিণতি দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন জগৎ দুঃখময়। তারপর, সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগী একজন সন্ন্যাসীকে দেখেন। সাথে থাকা সারথী ছন্দককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঐ শান্ত-সৌম্য ব্যক্তিটি কে’? ছন্দক বললেন, ইনি শান্তি অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেছেন। সিদ্ধার্থও দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে দুঃখমুক্তির উপায় চতুরার্য সত্য আবিষ্কার করেন। চতুরার্য সত্য হচ্ছে :

- ১ . দুঃখ আর্যসত্য
- ২ . দুঃখের কারণ আর্যসত্য
- ৩ . দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
- ৪ . দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

অনুশীলনমূলক কাজ  
চতুরার্য সত্য কী কী?

## পাঠ : ২

## চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা

## দুঃখ আর্ষসত্য

জগৎ দুঃখময়। সুখ এখানে ক্ষণস্থায়ী। যা কিছু আমরা সুখ বলে জানি, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ছুটে চলার মাঝে দুঃখই পাই বেশি। সুখ যেন পরশ পাথর, বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না সুখের আড়ালেই দুঃখ রয়েছে। জ্ঞানের অভাবে আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। অজ্ঞতাই দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ। সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ অনেক প্রকার। বুদ্ধ সেগুলোকে প্রধানত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. জন্ম দুঃখ
২. জরা দুঃখ
৩. ব্যাধি দুঃখ
৪. মৃত্যু দুঃখ
৫. অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ
৬. প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ
৭. ইন্দ্রিয় বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং
৮. পঞ্চক্ষণ্ডময় এ দেহ ও মন দুঃখময়।

এ দুঃখগুলো চরম সত্য। দুঃখ সর্বজনীন। সকলকে কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ হতে কারো নিস্তার নেই। তাই বুদ্ধ এগুলোকে দুঃখ আর্ষসত্য বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নানা দুঃখে পূর্ণ। জীবিত মানুষ মাঝেই নানারকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়ে, দাঁত পড়ে, দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। একে বলে জরাগ্রস্ত হওয়া। বার্ধক্য আঘাত হানে। চুল পাকে। এমনি করে একদিন মৃত্যু আসে। একজনের মৃত্যু হলে প্রিয়জন শোক করে। এভাবে দুঃখের সমুদ্রে মানুষের জীবন ভাসমান।

## অনুশীলনমূলক কাজ

দুঃখ আর্ষসত্যে বর্ণিত দুঃখসমূহ উল্লেখ করো (দলীয় কাজ)।

## দুঃখের কারণ আর্ষসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। সবকিছুরই কারণ আছে। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। দুঃখ আছে জেনেও মানুষ মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে আরও দুঃখ ভোগ করে। জন্ম নিলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাহলে কী কারণে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? জন্মের কারণ তৃষ্ণা। আর তৃষ্ণার কারণ অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হই এবং তা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পতঞ্জলি যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগুনের কাছে যায় এবং আহত বা হতও হয়, তেমনি মানুষও মোহাচ্ছন্ন হয়ে বারবার দুঃখ ভোগ করে। জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তু পাওয়ার জন্য তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। কামনা, বাসনা, লোভ, অহংকার, মোহ, শোক—এ সবই তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ।

অনুশীলনমূলক কাজ  
দুঃখের কারণ কী?

## দুঃখ নিরোধ আৰ্যসত্য

আমরা জেনেছি তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। জন্মগ্রহণ করে অসংখ্য দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। তৃষ্ণার ক্ষয় পুনর্জন্ম রোধ করে। তৃষ্ণার বিনাশ করাই দুঃখ নিরোধ আৰ্যসত্য।

## দুঃখ নিরোধের উপায় আৰ্যসত্য

রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঔষধ খেতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। সব সমস্যার সমাধান আছে। তথাগত বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করে দুঃখ নিরোধের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন, যা দুঃখ নিরোধের উপায় আৰ্যসত্য নামে পরিচিত। বুদ্ধ নির্দেশিত আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। ‘মার্গ’ অর্থ পথ। আটটি সত্য পথ অনুসরণ করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি। আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ:

১. সম্যক দৃষ্টি
২. সম্যক সংকল্প
৩. সম্যক বাক্য
৪. সম্যক কর্ম
৫. সম্যক জীবিকা
৬. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা
৭. সম্যক স্মৃতি
৮. সম্যক সমাধি।

অনুশীলনমূলক কাজ  
আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

পাঠ : ৩

## চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব

চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি। এই সত্যসমূহ বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্মকে কখনো বোঝা যাবে না। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য দুঃখ হতে মুক্তি এবং পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা। দুঃখসমূহ কী কী, কী কারণে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখের নিরোধ আছে কি না এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সঠিকভাবে না জানলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই চতুরার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। চতুরার্য সত্যের মাধ্যমে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। চতুরার্য সত্য মতে, তৃষ্ণাই মানুষের দুঃখের কারণ। অজ্ঞতার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার

তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চতুরার্য সত্য আমাদের লোভ, হিংসা, মোহ ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকার এবং দুঃখ হতে মুক্তির উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে চতুরার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা সহজে বোঝা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ  
কেন চতুরার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার?

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি দুঃখ আর্ষসত্য?

- ক. সম্যক জীবিকা  
গ. সম্যক বাক্য

- খ. ইন্দ্রিত বস্তুর অপ্রাপ্তি  
ঘ. সম্যক সমাধি

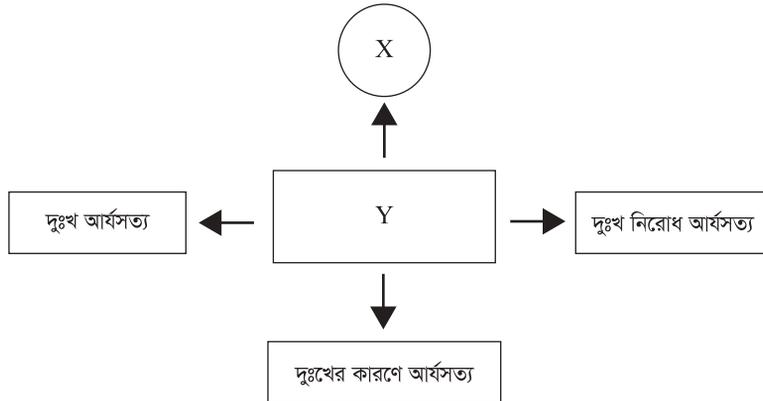
২. চতুরার্য সত্যের জ্ঞান অনুসরণে-

- i. দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি ঘটে  
ii. পূর্ণজন্ম রোধ করা যায়  
iii. পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
গ. ii ও iii  
খ. i ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. Y চিহ্নের মাধ্যমে কোনটি নির্দেশ করছে?

- ক. ত্রিপিটকখ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ  
গ. চতুরার্য সত্যঘ. তৃষণার ক্ষয়

৪. ছকের X চিহ্নিত অংশটির সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু-

- ক. দুঃখ নিরোধের উপায়খ. বারবার জন্মগ্রহণ  
গ. কামনা বাসনা পূরণঘ. হিংসার বিনাশ সাধন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুষমা একজন রাখাইন মেয়ে। তিনি একদিন কিয়াং (বিহার) এ প্রার্থনা করতে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন আরেকজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভক্তে, উনি কী করছেন? ভিক্ষু বললেন, তিনি ধ্যান সাধনায় মগ্ন আছেন। সাংসারিক জীবনে অভাব অনটনের কারণে সুষমা প্রায়ই কষ্টে থাকেন, মানসিক অশান্তিতে ভুগেন।

ক. চতুরার্য সত্য কী?

খ. দুঃখের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধধর্মের কোন পথ অনুসরণ করেছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. সুষমার কীভাবে তার মুক্তির চেষ্টা করতে পারেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. ঘটনা-১:

লাভলী ও সৈকত দম্পতির এক সন্তান। তাঁদের স্বপ্ন সন্তানকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সঙ্গদোষে তাদের সন্তান উচ্ছৃঙ্খল এবং তাদের অবাধ্য হয়ে যায়।

ঘটনা-২:

ছোটবেলা থেকে সীমান্ত বড়ুয়া দেখছে তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। রোগযন্ত্রনা বেড়ে গেলে এমন হয় যে তিনি নিজ সন্তানদেরও সহ্য করতে পারেন না। একদিন ঐ রোগের কারণেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মায়ের মৃত্যুতে সীমান্ত ভেঙ্গে পড়েন এবং শোক সহ্য করতে না পেরে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হন।

ক. দুঃখ আর্যসত্য কী?

খ. সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ এ দুঃখ আর্যসত্যের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সীমান্তের অনুসৃত পথের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নামগুলো লেখো।
২. সিদ্ধার্থ প্রথম কীভাবে বুঝলেন যে জগৎ দুঃখময়?
৩. বুদ্ধমতে দুঃখ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করো।
৪. ‘অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ’ -বুঝিয়ে লেখো।
৫. বুদ্ধ দুঃখকে কয়ভাগে বিভক্ত করেন? সেগুলো কী কী?

## সপ্তম অধ্যায়

# ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধরা নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। বৌদ্ধবিহার এবং পারিবারিক অঙ্গানে এসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানমতে আচরণীয় ও পালনীয় অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলে। কিছু কিছু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবধারায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধর্মীয় উৎসব নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বছরের বিভিন্ন সময়ে এরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এ অধ্যায়ে বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

\* বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারব;

\* বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।

## পাঠ : ১

### ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পরিচিতি

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দ্রবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো ধর্মীয় তিথি বা পর্ব। যেমন: বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি। এছাড়া যে অনুষ্ঠানগুলো বছরের যেকোনো সময় করা যায়, সেগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়। যেমন: সঙ্ঘদান, অষ্টপরিষকারদান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার ‘কঠিন চীবরদান’ অনুষ্ঠান করতে হয় বছরের নির্দিষ্ট মাসে। এটিও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানগুলো পালনের ব্যাপকতায় উৎসবে পরিণত হয়। বর্তমানকালে প্রায় সব অনুষ্ঠানই উৎসবের আকার ধারণ করে।

বৌদ্ধদের বেশির ভাগ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে অমাবস্যায় কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে প্রতিটি দিনই শুভ। অশুভ বলে কোনো দিন নেই। নিজের কর্মের মধ্যেই শুভ-অশুভ নির্ভর করে। এমন কোনো সময় নেই, যে সময় ভালো কাজ করলে কোনো সফল পাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যেকোনো দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যায়। তবে কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনেই সম্পাদন করতে হয়। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা সকলের উচিত। এতে মন প্রসন্ন হয়। চিন্তা শুদ্ধ হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নৈতিকতা জাগ্রত হয় এবং জীবন সুখের হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমাকেন্দ্রিক। প্রতিটি পূর্ণিমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনো না কোনো ঋণীয় ঘটনা জড়িত রয়েছে। বুদ্ধের জীবনাদর্শ ঋরণ ও অনুশীলনের জন্য বিবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। মূলত, এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঋরণীয় ঘটনাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। প্রতিটি পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নর-নারী সকলে বিহারে সমবেত হয়। সম্মিলিতভাবে বুদ্ধপূজা ও উপাসনা করে। পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ করে। দুপুরে ধ্যান সমাধি চর্চা করে। বিকালে ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা-উঠ, ফর্মা নং-৮

শোনে। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও পানীয় পূজা করে। অনেক বৌদ্ধবিহারে বিকালে ধর্মসভা ও সন্ধ্যায় বুদ্ধকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। রাতে নির্মল আনন্দচিন্তে সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

এই ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধরা একত্র হয়। তাই এসব অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো একরকম সামাজিক মিলনমেলা। এগুলো ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালন করতে হয়। এ অনুষ্ঠানসমূহে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল প্রাণীর মজ্জল কামনা করা হয়।

বৌদ্ধদের কিছু অনুষ্ঠান আছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেগুলোকে পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বলা যায়। যেমন: শ্রমণের প্রব্রজ্যা, মৃতদেহ সংস্কার, সূত্র বা পরিত্রাণ পাঠ প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও এলাকার লোকজন সমবেত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তাই এ অনুষ্ঠানগুলোরও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাযথ মর্যাদার সাথে প্রতিপালন করা হয়। স্ব স্ব ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন করা প্রয়োজন।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বৌদ্ধ ধর্মীয় কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের নাম লেখো।

পাঠ : ২

## ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন। সম্মিলিতভাবেই এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল অনেক। যেমন: ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ধর্মকথা শ্রবণ করে অস্থির মন শান্ত, প্রসন্ন ও উদার হয়। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। কঠিন ধর্মবাণী বুঝতে সহজ হয়। পুণ্য অর্জিত হয়। দান চিন্তা উদয় হয়। নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। দয়াপরায়ণ ও পরোপকার করতে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনি তুলে ধরব। খেরী উত্তমা গুর্বজন্মে এক ধনশালীর গৃহপরিচারিকা ছিলেন। সেই ধনশালী প্রভু সব সময় নানা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। একদিন উত্তমাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় শ্রদ্ধাচিন্তে অনুষ্ঠানের সকল কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি মনে মনে কামনা করেন, ভবিষ্যতে তিনিও যেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন দাতা হতে পারেন। এই সুকৃতি ও শুভ কামনার ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীনগরের এক ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর দান করতেন এবং মহান দাতা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই সকলের একাগ্রচিন্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা উচিত।

বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর একটি এলাকার অধিবাসীরা একটি সর্বজনীন ধর্মোৎসব আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহা উৎসাহে সকলে কাজে লেগে গেল। চতুর্দিকে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হলো। তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের নিমন্ত্রণ জানানো হলো। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অন্ন-পানীয় দিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করা। যথাসময়ে সকল আয়োজন সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানের দিন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হলেন। সকলে মিলে তাঁদের অন্ন-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল। নিজেরাও দুপুরের খাবার খেল। তারপর শুরু হলো ধর্মালোচনা সভা। এসময় আয়োজকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গেল। কেউবা গল্পগুজব আরম্ভ করল। কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু

লোক অন্যমনস্ক ছিল। শ্রদ্ধাচিহ্নে ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করল মাত্র কয়েকজন। বুদ্ধশিষ্যরা বিষয়টি লক্ষ করলেন। তাঁরা তথাগত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে এলাকাবাসী নিজেরা কেন ধর্ম শ্রবণে অপারগ হলো? উত্তরে বুদ্ধ বললেন, ‘ধর্মাচরণের আনন্দ সকলে লাভ করতে পারে না। ধর্মের রসবোধ উপলব্ধিতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। গভীর সমুদ্র যেমন সকলে পাড়ি দিতে পারে না, তেমনি ধর্মপথ পাড়ি দিতে পারে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মাত্র। যাঁরা একাগ্রচিত্ত ও সচেতন, তাঁরাই পারে জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি অর্জন করতে।’ তাই সর্বদা শ্রদ্ধাচিহ্নে একাগ্রতার সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের কয়েকটি সুফল লেখো।

পাঠ : ৩

## বুদ্ধ পূর্ণিমা

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে খ্যাত। এ দিনে সিদ্ধার্থ গৌতম হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শাক্যরাজ্যে রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি একই তিথিতে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। আশি বছর বয়সে একই পূর্ণিমা তিথিতেই কুশীনগরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষায় এটিকে মহাপরিনির্বাণ বলে। গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের এই তিনটি মহান ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধপূর্ণিমাও বলা হয়। বৌদ্ধদের কাছে এ পূর্ণিমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমকের সাথে বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে থাকে।



বুদ্ধ পূর্ণিমায় পূজার উপকরণ নিয়ে উপাসক-উপাসিকা বিহারে যাচ্ছেন

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূত্র পাঠ ও বুদ্ধকীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরি করে বুদ্ধপূর্ণিমা উৎসবের সূচনা হয়। আগের দিন বৌদ্ধবিহারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নানা রকম ফুল, পাতা ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এভাবে অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে বুদ্ধপূজা, সমবেত উপাসনায়, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করা হয়। দুপুর বারোটোর আগে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দুপুরের আহার দান করা হয়, যা পিণ্ডদান নামে পরিচিত। দায়ক-দায়িকরাও দুপুরের আহার সম্পন্ন করে বৌদ্ধবিহারে ধ্যান সমাধি করেন। বিকালে ধর্মসভা হয়। এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন হয়। আজকাল অনেক বৌদ্ধবিহারে এ উপলক্ষে রক্তদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে মরণোত্তর চোখ দান করার প্রতিশ্রুতি দেন, যা অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সন্ধ্যায় অনেক বৌদ্ধবিহারে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এতে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ঘটনাগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘটেছিল। যেমন: জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী কাননে। এটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত। গাছপালা তরুলতায় ভরা ছিল লুম্বিনী কানন। বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল গয়ার উন্মুক্ত বোধিবৃক্ষমূলে। এটি বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া জেলায় অবস্থিত। মহাপরিনির্বাণ হয়েছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরস্থ কুশিনগরের জোড়া শালবৃক্ষের মূলে। তাই প্রকৃতির প্রতিও মৈত্রী প্রদর্শন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছেঁড়া ও ডালপালা কাটা উচিত নয়। বিদ্যালয় ও বাড়ির আঙিনার আশেপাশে গাছের পরিচর্যা করা সকলের উচিত। প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি 'বৈশাখ ডে' নামে উদ্‌যাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকার বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধপূর্ণিমা অনুষ্ঠানের  
একটি দিনব্যাপী কর্মসূচি তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

## আষাঢ়ী পূর্ণিমা

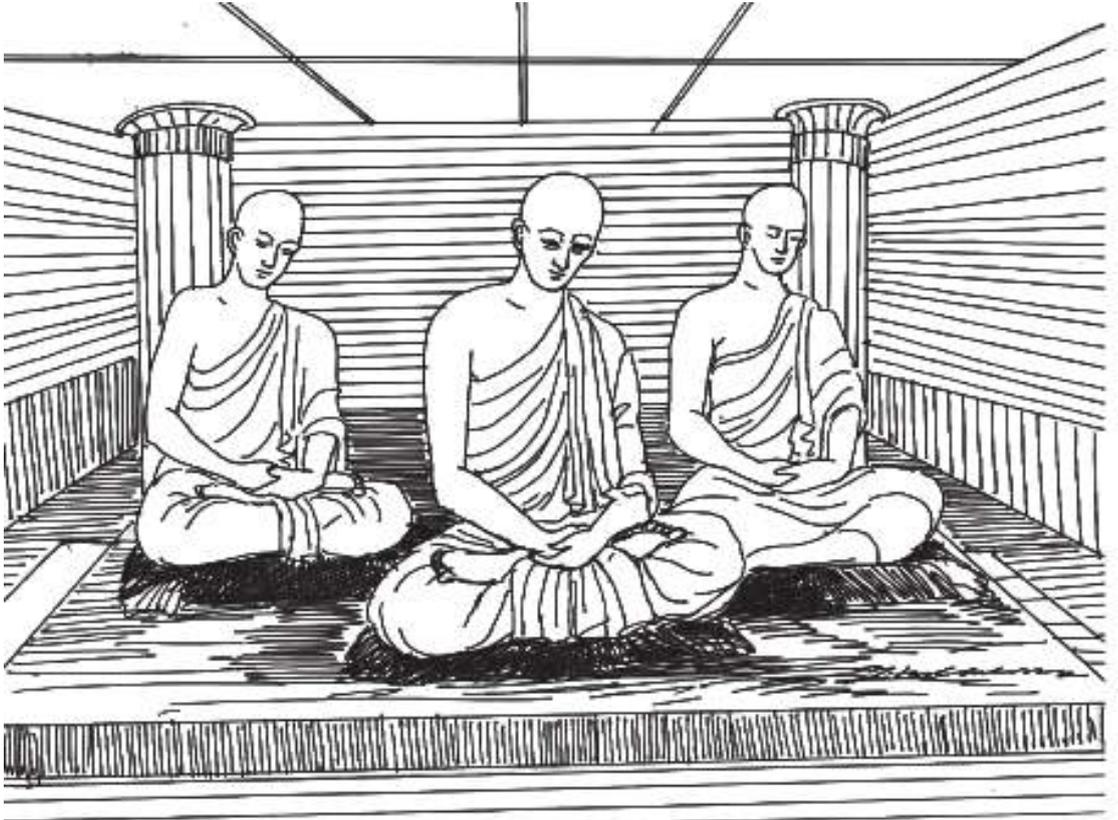
আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিই আষাঢ়ী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হলো মাতৃগর্ভে প্রতिसন্নিধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্ম প্রচার।

কথিত আছে যে, এ শুভ পূর্ণিমা তিথির রাতে শাক্যরাজ্যের রানি মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, দেবতারাত্মকে একটি মনোরম পালঙ্কে করে অনোবতপ্ত হৃদের তীরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই একটি সাদা হাতি ডান দিক দিয়ে তাঁর শরীরে একটি শ্বেতপদ্ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরদিন রানি রাজা শুম্বোধনকে তাঁর সুন্দর স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। রাজা শুম্বোধন জ্যোতিষীদের ডেকে স্বপ্নের কারণ জানতে চান। জ্যোতিষীরা বলেন, মহারাজ শীঘ্রই পুত্রসন্তান লাভ করতে যাচ্ছেন এবং এই ভাবী পুত্রসন্তানই হবেন মহাজ্ঞানী বুদ্ধ। এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজর্ঠরে প্রতিসন্নিধি গ্রহণ করেন।

এমনই এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংসারের সকল ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এ সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের বয়স হয়েছিল ঊনত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্ত্রীপুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি ‘মহাভিনিক্ষেপন’ নামে বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। মহাভিনিক্ষেপন বলতে বুদ্ধের গৃহত্যাগকে বোঝায়।

বুদ্ধত্ব লাভের পর আরো এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা হলেন : কোণ্ড্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিত। বুদ্ধের প্রচারিত প্রথম ধর্মবাণীকে বলা হয় ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’। জীবজগতের কল্যাণে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধের মহৎ জীবনের স্মৃতি বিজড়িত এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় ও বরণীয় তিথি।

এ পূর্ণিমার সাথে আরো কিছু ধর্মীয় বিষয় সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসব্রত পালনের নির্দেশ দেন। তখন থেকে ভিক্ষুরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন। এ সময় তাঁরা ধর্ম-বিনয় অধ্যয়ন এবং ধ্যানচর্চায় রত থাকেন। সে সময় জ্বরুরি কারণ ছাড়া কোনো ভিক্ষু নিজ বিহারের বাইরে রাত্রিযাপন করতে পারেন না। এটি ভিক্ষুদের বিনয় বিধান। ২) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ পরলোকগত মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম দেশনার জন্য তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন মাস অবস্থান করেন এবং মাতা মায়াদেবী ও দেবতাদের নিকট অভিধর্ম দেশনা করেন। ৩) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন।



বুদ্ধপূর্ণিমার মতো, এ পূর্ণিমা তিথিতেও উপাসক উপাসিকাগণ বিহারে সমবেত হন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে তাঁরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। যাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করেন, তাঁরা ঐ দিন উপোসথ পালন করেন। এ সময় ভিক্ষুরা উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। এতে গৃহীদের মধ্যে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া একসাথে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্ম চর্চা করার কারণে নিজেদের মধ্যেই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ভোর থেকেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শুরু হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে ওঠে বৌদ্ধবিহার। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় সমগ্র কর্মসূচি। অনেকে এ তিথিকে উপলক্ষ করে নিজ বাড়িতে বসে রাত পর্যন্ত বিদর্শন ভাবনা করেন। আবার অনেকে তিন দিন বা এক সপ্তাহের জন্য ধ্যান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

### অনুশীলনমূলক কাজ

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঘটনা বর্ণনা করো।

## পাঠ : ৫

### মধুপূর্ণিমা

দান, সেবা ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল মধুপূর্ণিমা তিথি। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় মধুপূর্ণিমা। এরূপ নামকরণের ক্ষেত্রে দানের একটি কাহিনি রয়েছে, যা বৌদ্ধ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একসময় বুদ্ধ কৌশাম্বিতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় সম্পর্কীয় একটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়। ক্রমে কলহের প্রভাব কৌশাম্বির সকল আবাসিক ভিক্ষুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভিক্ষুরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একসময় বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বুদ্ধ সকল ভিক্ষুদের আহ্বান করে কলহ-বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন। রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ে অনড় থাকা উচিত নয় বলে তিনি সকলকে জানান। এ উপদেশ প্রদানকালে বুদ্ধ তাদের দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনি বলেন। সে কাহিনিতে উল্লেখ আছে যে, কলহ ও রাগের প্রভাব জন্ম জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এতে উভয়ের ক্ষতি ছাড়া কোনো মঙ্গল হয় না। এমনকি শুধু কলহজনিত রাগের কারণে কোনো ভালো কাজও উপযুক্ত সময়ে করা যায় না। তাই সব সময় কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। বুদ্ধের নানাবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুরা কলহ থেকে বিরত হলেন না। নিজেদের মধ্যে কলহ ত্যাগ করে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করতে পারলেন না।

তখন বুদ্ধ কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুদের সংসর্গ ত্যাগ করে নিজে একাকী নির্জন গহিন বনে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। একসময় তিনি চলে গেলেন পারিল্যেয় নামক বনে। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তিনি সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করতে লাগলেন। বুদ্ধ বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করছিল একটি হাতি। হাতিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের শুঁড় দিয়ে বুদ্ধের বসবাসের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেয়। হাতিটি বুদ্ধের জন্য নিয়মিত পানীয় জলও সংগ্রহ করে আনত। সেবা দানের জন্য সব সময় তৎপর থাকত। এভাবে হাতিটি নিজের ইচ্ছাতেই বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত থাকত। বন্য প্রাণী হাতির এরূপ সেবাপরায়ণতা দেখে বনের এক বানরও বুদ্ধকে সেবা করতে আগ্রহী হয়। সেই চেতনায় বানরটি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ বানরের দেওয়া মধু সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। এতে বানর খুবই প্রীত হয়। মনের সুখে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে লাফাতে থাকে। বানরটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফানোর সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধ দিব্যচক্ষুতে দেখলেন যে, মধুদানের ফলে বানর মৃত্যুর পর দেবলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে। এ অনন্য ঘটনাকে স্মরণ করে বৌদ্ধরা এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসঙ্ঘকে মধু দান করে।

এসব কারণে ভাদ্র পূর্ণিমাকে মধুপূর্ণিমা বলা হয়। এছাড়া কৌশাম্বির ভিক্ষুরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কলহ ত্যাগ করেন এবং পারস্পরিক মধুময় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।



বানর বুদ্ধকে মধু দান করছে

এ পূর্ণিমায় যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা প্রায় অন্যান্য পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের মতো। মধু দান করা এ পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ তিথিতে বৌদ্ধরা বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের উদ্দেশে মধু দান করে। বিহারে আগত উপাসক-উপাসিকারা পরস্পরকে মধু ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করে। এভাবে দান ও সেবার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

**অনুশীলনমূলক কাজ**

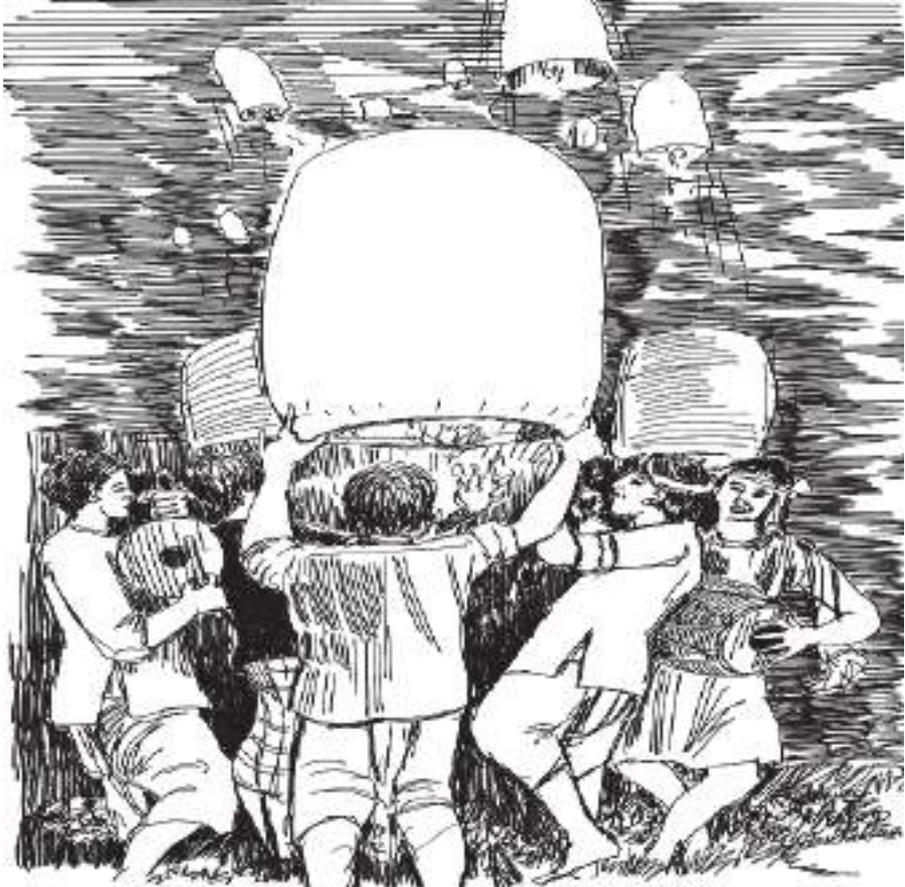
মধুপূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

মধুপূর্ণিমা থেকে আমরা কোন শিক্ষা পাই?

## পাঠ : ৬ প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই প্রবারণা পূর্ণিমা। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এ পূর্ণিমা তিথির সঙ্গেও বুদ্ধের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িত আছে। যেমন: এ পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত পালন সমাপ্ত হয়। এ পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ! বহুজনের মজ্জালের জন্য, হিতের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। প্রচার করো সেই ধর্ম, যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।’ এ পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়। ‘প্রবারণা’ শব্দের অর্থ হলো সন্তুষ্টি বা ইচ্ছার পূর্ণতা, উৎসব, বরণ করা, বারণ করা ইত্যাদি। কুশলসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা এবং অকুশলসমূহ বারণ করা ই হচ্ছে প্রবারণা। বর্ষাবাসব্রতের সমাপ্তি এবং মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান উৎসবের সূচনা করে বলে প্রবারণাকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিনও বলা হয়।

বর্ষাবাসব্রতের সমাপ্তি, কঠিন চীবরদান উৎসবের শুরু, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিশুদ্ধিতা অর্জন, অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন, বুদ্ধ কর্তৃক যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন প্রভৃতি কারণে প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ জগতে একটি অনন্য স্মরণীয় উৎসব।



ফানুস উত্তোলন অনুষ্ঠান

প্রবারণা পূর্ণিমা একটি উৎসবমুখর দিন। এদিনে ফানুস ওড়ানো হয়। বিশেষ করে ফানুস বানানোর জন্য পূর্ণিমা তিথির কয়েকদিন আগে থেকেই বৌদ্ধ গ্রামসমূহে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও প্রদীপ পূজার পর বৌদ্ধবিহারে ফানুস ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেও ফানুস উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ, আবাল বৃদ্ধবনিতা সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হয় এবং ফানুস ওড়ানো উপভোগ করে। নানা রকম বাদ্যবাজনার তালে তালে, সংকীর্তনের ঝংকারে নেচে-গেয়ে বর্ণিল ফানুস আকাশে ওড়ানো হয়। রাতে এ দৃশ্য অপরূপ মনে হয়। এভাবে প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

এ পূর্ণিমা উদ্যাপনে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা নির্দোষ ও পবিত্র থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। এজন্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন: প্রবারণা পূর্ণিমায় বৌদ্ধভিক্ষুরা ভিক্ষুসীমায় বসে পরস্পরের কাছে দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এটি হলো আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নিজের মন পবিত্র হয় এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদেরও দোষ-ত্রুটির জন্য পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এতে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মনের রাগ ও হিংসা দূর হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৭

## মাঘী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহের মধ্যে মাঘী পূর্ণিমাও গুরুত্বপূর্ণ। এ পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ লাভের ঘোষণা। এ তিথিতে বুদ্ধ নিজের আয়ু সংস্কার বিসর্জন বা মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্রে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভিক্ষুসম্মুহকে বলেছিলেন, ‘এখন হতে তিন মাস পর আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।’ এভাবে নিজের জীবন অবসানের দিনক্ষণ ঘোষণা করা সাধারণের জীবনে বিরল। জগতে হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবন অবসানের ঘোষণার জন্য এই দিনটি শোকের বা দুঃখের মনে হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে এটি মহৎ ও মহান একটি দিন। কারণ বুদ্ধ বলেছেন, উৎপন্ন সকল কিছুই বিনাশ অনিবার্য। অর্থাৎ জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। জগতের সকল কিছুই অনিত্য ও অনাত্মা নিয়মে বাঁধা। বুদ্ধ এই সত্যকে সাধনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি সম্যক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর আয়ু সংস্কার ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্য সকল পূর্ণিমা উৎসবের মতো মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানমালাও খুব সকাল থেকে শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ, বুদ্ধ পূজা, সমবেত উপাসনা, দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া ধর্মালোচনা, সাক্ষ্যকালীন বন্দনা ও পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিও আয়োজন করা হয়।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা -৬ষ্ঠ, ফর্মা নং-৯

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের জীবনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

- ক. ৩                      খ. ৫  
গ. ৬                      ঘ. ৭

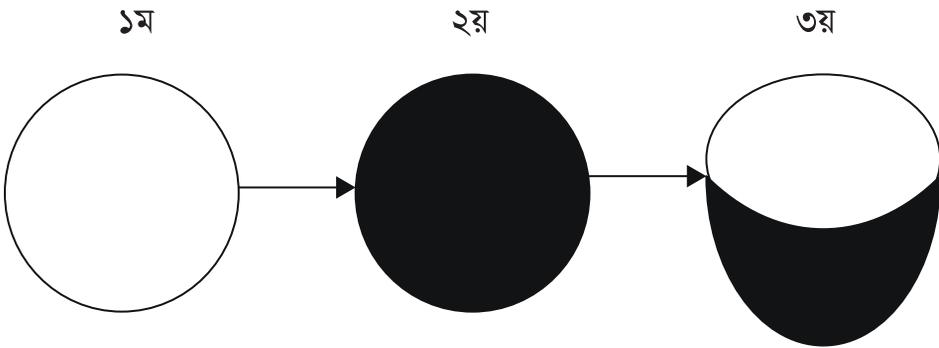
২. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদানের ফলে -

- i. পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়  
ii. মানসিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে  
iii. দান করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii                খ. i ও iii  
গ. ii ও iii              ঘ. i, ii ও iii

নিচের মডেলগুলো দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র : সময়ের ভিত্তিতে চাঁদের প্রকৃতি

৩. ১ম মডেলটি কী ইঙ্গিত বহন করছে?

- ক. পূর্ণিমার           খ. কৃষ্ণ অষ্টমীর  
গ. শুক্লা অষ্টমীর   ঘ. অমাবস্যার

৪. ৩য় মডেলের সম্পর্কিত ঘটনায় গৃহীরা -

- i. অষ্টশীল গ্রহণ করেন  
ii. বুদ্ধ কীর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেন  
iii. তীর্থস্থানে গমন করেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii           খ. i ও iii  
গ. ii ও iii       ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১:

ভিক্ষুরা এক পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাব্রত পালনের জন্য বিহারে সমবেত হলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। দুপুরে ধ্যান সমাধির চর্চা করেন। ধর্মদেশনার একপর্যায়ে ভণ্ডে বলেন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ ও সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

ঘটনা-২:

ক্যাজরী মার্মা একদিন সন্ধ্যায় ফানুসবাতি উড়ানো অনুষ্ঠান দেখে বাবার কাছে জানতে চাইলো, এ অনুষ্ঠানের সাথে বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা জড়িয়ে আছে। বাবা বললেন, এ তিথিতে বুদ্ধ মাতা এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংশ স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তাছাড়া এই দিনে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পালন সমাপ্ত হয়।

- ক. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের কথা কোন পূর্ণিমায় ঘোষণা করেন?  
খ. ভাদ্র পূর্ণিমাকে মধুপূর্ণিমা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।  
গ. ঘটনা-১ এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পূর্ণিমার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।  
ঘ. ঘটনা-২ 'প্রবারণা পূর্ণিমার প্রতিচ্ছবি'-তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো

২. অনিল বড়ুয়া এক ছুটির দিনে ভোর বেলায় বিহারে গিয়ে সূত্রপাঠ এবং বুদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে প্রভাত ফেরিতে অংশ নেন। পরে বুদ্ধ পূজা করেন এবং দুই হাত যুক্ত করে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেন। দুপুরের আগেই তিনি ভিক্ষুসংঘকে খাবার দেন। বিকেলে ধর্মসভায় বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনেন। অপরদিকে শ্রীতি বড়ুয়া এবং শ্রুতি বড়ুয়া দুই বোন। ধর্ম পালনে তাদের মন নাই। তারা সারাদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। মা চেষ্টা করেও তাদের নিবৃত্ত করতে পারেন না।

ক. প্রবারণা পূর্ণিমা কী?

খ. মাঘী পূর্ণিমা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোন পূর্ণিমার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দুই বোনের কার্যকলাপের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৌদ্ধদের আনন্দের দিন কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা কোন মাসে এবং কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়?
৩. প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লেখো।
৪. বৌদ্ধধর্মে ধর্মীয় তিথি বা পর্ব বলতে কী বোঝায়?
৫. মধু পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? ব্যাখ্যা করো।

## অষ্টম অধ্যায়

# চরিতমালা

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কেউ চিরদিন এ জগতে বেঁচে থাকেন না। মানুষের কর্মই মানুষকে অমরত্ব দান করে। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে এবং ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। মহৎ মানুষের জীবনকথা সং জীবন যাপনের প্রেরণা এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

\* জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;

\* খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারব।

### পাঠ : ১

## জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মহৎ ও আদর্শসম্পন্ন জীবনচরিত মানুষকে আকৃষ্ট করে। আদর্শিক জীবন গঠনে প্রেরণা জোগায়। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এরূপ জীবন অর্জিত হয়। খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। এতে অনেক অনুশীলনীয় বিষয় রয়েছে, যা সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষকে সৃষ্টিশীল কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

জগতে সহজে কিছু লাভ করা যায় না। একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও সংযম ছাড়া মহৎ জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। চরিত্রের এই গুণগুলো জীবনের গতির সাথে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়। খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠে দেখা যায়— তাদের জীবনেও সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না ও বেদনা ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো আনন্দে বিভোর ও দুঃখে বিমর্ষ হয়ে আদর্শচ্যুত হননি। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ ও মহানুভব। আমাদের জীবনও সুন্দরভাবে গঠন করার লক্ষ্যে তাঁদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এগুলো পাঠের মাধ্যমে আমাদের আদর্শিক চেতনা ও নৈতিকবোধ আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক নারী-পুরুষের জীবনী পাওয়া যায়, যাঁরা কর্মগুণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হয়েছেন। ভিক্ষুদের খের আর ভিক্ষুণীদের খেরী বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে। খেরদের মধ্যে উপালি ও আনন্দ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। খেরীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কৃশাগৌতমী, ক্ষেমা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসক নামে খ্যাত। তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

### অনুশীলনমূলক কাজ

কয়েকজন বৌদ্ধ খের-খেরীর নাম লেখো।

বুদ্ধের গৃহীশীষ্যদের নাম লেখো।

## পাঠ : ২

## উপালি থের

উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর নিম্নকুলের নাপিত বংশে। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। তাঁর মাতার নাম ছিল মন্তানী। পূর্ণ ছিলেন অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কেশ্বিল, ভদ্দীয়, আনন্দ, দেবদত্ত প্রমুখ রাজপুত্রের সহচর।

বুদ্ধ এক সময়ে অনুপ্রিয় নামক স্থানের আম্রবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় কয়েকজন রাজপুত্র ঠিক করলেন তাঁরা একত্রে বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে একদিন তাঁরা বুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পূর্ণও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূরে এসে তাঁরা থামলেন। তারপর সকলে নিজেদের মূল্যবান পোশাক খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা বললেন, ‘পূর্ণ! এসব তোমাকে দিলাম। তুমি কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও।’ এ বলে রাজপুত্ররা চলে গেলেন। পূর্ণ তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, কপিলাবস্তুতে ফিরে গিয়ে রাজপুত্রদের সংসার ত্যাগের কথা কীভাবে জানাবেন? তিনি আরও ভাবলেন, নাপিত বংশে আমার জন্ম। এই মূল্যবান পোশাক আমার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া তাঁরা রাজপুত্র। তাঁদের বিপুল অর্থ, ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। এসব ছেড়ে তাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার তো কিছুই নেই। এ বলে তিনি মূল্যবান পোশাকগুলো একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে



রাজপুত্ররা পূর্ণকে পোশাক ও অলংকার খুলে দিচ্ছেন

রাজকুমারদের পথে পা বাড়ালেন। ইতোমধ্যে অনুরুদ্ধ, ভৃগু, আনন্দ প্রমুখ রাজকুমারগণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যার্থমে দীক্ষিত হওয়ার প্রার্থনা জানালেন। এমন সময় পূর্ণও এসে বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন রাজকুমারগণ বুদ্ধকে অনুরোধ করে বললেন, ‘ভক্তে! আগে পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহলে তাকে আমরা প্রণাম ও সম্মান করতে বাধ্য হবো। এতে আমাদের বংশমর্যাদা ও অহংকার দূর হবে।’ তাঁদের অনুরোধ শুনে বুদ্ধ খুশি হলেন। বুদ্ধ প্রথমে পূর্ণকে এবং পরে রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর পূর্ণের নাম হয় উপালি।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েক দিন পরই উপালি বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে থেকে ধর্ম বিনয় অনুশীলন করতে বললেন। উপালি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে অর্হত্ব ফল লাভ করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের সঙ্গে থেকে উপালি বিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিনয়ে দক্ষতা দেখে বুদ্ধ তাঁকে ‘বিনয়ধর’ (নীতিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা করেন।

একদিন উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপালি ভিক্ষুদের নিম্নরূপ উপদেশ দান করেন, ‘প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রব্রজিত কর্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গৃহ হতে বের হয়ে শুদ্ধ জীবন যাপনকারী, শৌর্যবান কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হবেন। সঞ্জের মধ্যে বাস করবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করবেন। যোগ্য অযোগ্য বিষয়ে সুদক্ষ হবেন এবং তৃষ্ণা উৎপাদন না করে বাস করবেন।’

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম মহাসজ্জীতিতে উপালি বিনয় আবৃত্তি করেন। সেই মহাসজ্জীতিতে পঁচাত্তর মহাজ্ঞানী অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপালির আবৃত্তি করা বিনয়ের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে এগুলো বিনয়পিটক নামে সংকলিত করা হয়। বুদ্ধ প্রদত্ত বিনয়ধর অভিধার মর্যাদা রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এটি তাঁর জীবনের পরম গৌরব। প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষের জীবনে অনেক কিছু করা সম্ভব। এর জন্য বংশমর্যাদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সৎ কর্ম করার প্রচেষ্টা। উপালি খের’র জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

উপালির সঙ্গে যাঁরা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন, তাঁদের নামগুলো লেখো। (দলীয় কাজ)

### পাঠ : ৩

#### আনন্দ খের

আনন্দের জন্ম শাক্যরাজ বংশে। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের কাকাতো ভাই ছিলেন। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনুরুদ্ধ, ভৃগু, ভদ্রীয় ও অন্যান্য শাক্য রাজকুমারদের সাথে তিনি একই দিনে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আনন্দ সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং আটটি শর্তের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি ভালো বক্তা ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর, তখন তাঁর একজন স্থায়ী সেবকের দরকার হয়। সারিপুত্র, মৌদ্গল্লায়ান এবং আনন্দসহ অনেকেই বুদ্ধের সেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জানতেন, আনন্দ কল্পকাল ধরে এই পদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে আসছেন। আনন্দ তখন মাত্র স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাই আনন্দ খেরকে সেবক পদে নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আনন্দ সব সময় বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন। তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন।

এসব উপদেশ ‘মহাপরিনির্বাণ’ সূত্রে পাওয়া যায়। আনন্দ খের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বুদ্ধের সেবা করতেন। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিতেন, তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সব উপদেশ মনে রাখতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি বুদ্ধের যেকোনো উপদেশ প্রয়োজনে হুবহু অন্যকে বলতে পারতেন। এ জন্য তিনি ‘ধর্মভাষ্যিক’ ও ‘শ্রুতিধর’ ভিক্ষু নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অল্পকাল পরেই রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাসঙ্গীতিতে একমাত্র অর্হৎ ভিক্ষুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তবে বুদ্ধের সেবক ও শ্রুতিধর হিসেবে আনন্দের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ মহাসঙ্গীতির পূর্বরাতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই রাতেই তিনি অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। অর্হত্ব লাভ করে তিনি ভিক্ষুদের অনেক উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে দুটি উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১. কর্কশ বাক্যভাষী, ক্রোধী, অহংকারী এবং সংঘভেদকারী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না,

তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত নয়।

২. শ্রদ্ধাবান, শীলবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সঙ্গ উত্তম।

এদিকে মহাসঙ্গীতি উপলক্ষে সম্মেলনকক্ষে সকল অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হন। শুধু আনন্দ খের ছিলেন অনুপস্থিত। মহাসঙ্গীতি শুরু হলো। হঠাৎ সকলেই দেখলেন আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সকলের মন খুশিতে ভরে উঠল। কথিত আছে, তিনি আকাশপথে এসে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আনন্দ ধর্ম (সূত্র ও অভিধর্ম) আবৃত্তি করেছিলেন।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় আনন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মহারাজ শুম্ভোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এতে সম্মত হননি। পরে আনন্দের প্রবল অনুরোধে নারীদেরও সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন। সে সময়ে নারীদের ভিক্ষুণী পদের মর্যাদা প্রদান করা খুবই কঠিন ছিল। নারীদের গৃহে থাকাই ছিল সামাজিক প্রথা। তাই বলা হয়, মাতৃজাতিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিতকরণে আনন্দ খের র ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

আনন্দ খের র দুটি উপদেশ লেখো।

পাঠ : ৪

## কৃশা গৌতমী খেরী

বুদ্ধের সময়ে কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তী নগরের এক গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। তাঁর বিবাহিত জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারেননি। অনাদর-অবহেলায় কেটেছে তাঁর জীবন। অসময়ে তাঁর স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তিনি সম্মান লাভ করেন। পুত্রটিই ছিল তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা। পুত্রটি বড় হয়ে ক্রমে কৈশোরে উত্তীর্ণ হলে হঠাৎ তারও মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগল হয়ে যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সকলের কাছে মৃত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ঔষধ ভিক্ষা চাইলেন। ঔষধ কেউ দিতে পারলেন না। বরং নগরবাসী কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে ভৎসনা করলেন। কৃশা গৌতমী কারো কথাতেই দ্রুক্ষেপ করলেন না। সন্তানকে বাঁচানোর আশায় তিনি ছুটে চললেন প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে। অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তি তাঁকে তথাগত বুদ্ধের



মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃশা গৌতমী বুদ্ধের কাছে আসছেন

কাছে গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে বললেন। অতঃপর কৃশা গৌতমী মৃত সন্তান কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে তিনি বুদ্ধকে বললেন, ‘ভগবান! আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন।’ বুদ্ধ কৃশা গৌতমীর দিকে তাকালেন এবং ধ্যান চেতনায় দেখলেন কৃশা গৌতমীর পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতি আছে। কিন্তু এ জন্মের নানাবিধ কর্ম ও কর্মফলে তার হৃদয় কষ্টে ভরপুর। বুদ্ধ তার মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য তাঁকে বললেন; ‘নগরে গিয়ে এমন একটি ঘর থেকে সরিষাবীজ নিয়ে এসো, যে ঘরে কখনো কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি।’ বুদ্ধের কথা শুনে কৃশা গৌতমী কিছুটা শান্ত হন এবং মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি নগরে প্রবেশ করেন। তিনি প্রতিটি ঘরের দরজায় গিয়ে সরিষাবীজ ভিক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ঘরে কোনো মৃত্যু ঘটেছে কি না। সকল ঘরে একই উত্তর পেল, এখানে কত মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো ঘরই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। ‘জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। সর্ব বস্তু অনিত্য।’ অতঃপর পুত্রের সৎকার করে তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে যান। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, ‘গৌতমী! সরিষাবীজ পেয়েছ কি? কৃশা গৌতমী বললেন, ‘ভগবান! সরিষাবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষা দিন।’ তখন বুদ্ধ তাকে বললেন, ‘বন্যার স্রোত যেমন গ্রাম, নগর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভোগবিলাসে রত মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়।’ বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি খুব ভালোভাবে ভিক্ষুণী জীবনের নিয়ম পালন করেন। সকল প্রকার লোভ, হিংসা, মোহ, তৃষ্ণা ক্ষয় করে তিনি অর্হত্বপ্রাপ্ত হন। বুদ্ধ তাঁকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। স্বীয় সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তিনি অনেক গাথা ভাষণ করেছিলেন।

তাঁর কিছু উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো :

- ১) সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জ্ঞানীগণ প্রশংসা করেন। সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে জ্ঞানী হওয়া যায়।

- ২) সৎ মানুষের অনুসরণ করো। এতে জ্ঞান বর্ধিত হয়।
- ৩) চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।
- ৪) আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নির্বাণ উপলব্ধি করেছি।
- ৫) আমি বেদনা মুক্ত, ভার মুক্ত। আমার চিত্ত সম্পূর্ণ মুক্ত।

### অনুশীলনমূলক কাজ

কৃশা গৌতমী কীভাবে বুঝলেন যে সকলে মৃত্যুর অধীন? বর্ণনা করো।

## পাঠ : ৫

### অভিরূপা নন্দা

হিমালয়ের পাদদেশে ছিল কপিলাবস্তু রাজ্য। এই রাজ্যে শাক্য জাতি বাস করত। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন শাক্যদের রাজা। শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য রাজ্যটি কয়েকজন নায়কের অধীন বিভক্ত ছিল। তেমনি এক নায়ক ছিলেন ক্ষেমক। নন্দা ছিলেন ক্ষেমকের প্রধান স্ত্রীর কন্যা। নন্দা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় অভিরূপা নন্দা।

নন্দা বিবাহযোগ্যা হলে বহু ধনী ব্যক্তির পুত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। অনেক বিচার-বিবেচনা করার পর নন্দা এক শাক্য যুবককে পছন্দ করলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই দিনই সেই শাক্য যুবকের মৃত্যু হয়। সমাজে তখন তা অমঙ্গল হিসেবে বিবেচিত হতো। নন্দার মা-বাবাও ভীষণ মর্মান্বিত হন। তাঁরা ঠিক করলেন নন্দাকে সংসারধর্মে আবদ্ধ না রাখতে। অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তাঁকে প্রব্রজিত করলেন। প্রব্রজিত হলেও নন্দা তাঁর রূপের জন্য খুব অহংকার করতেন। মস্তক মুণ্ডিত করে ভিক্ষুণীর বেশ গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরিবারের সিদ্ধান্তে বাধ্য হয়ে নন্দা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নন্দার নতুন জীবন শুরু হলো। নন্দা এখন ভিক্ষুণী। কিন্তু ভিক্ষুণী হলেও তিনি রূপের অহংকার করতেন। উপদেশ শোনার জন্য প্রতিদিন অনেক ভিক্ষুণী বুদ্ধের নিকট যেতেন। কিন্তু নন্দা বুদ্ধের সামনে যেতে ভয় পেতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, বুদ্ধ তাঁর মনোভাব জেনে তাঁকে সকলের সামনে ভর্ৎসনা করতে পারেন। এই ভয়ে তিনি সবসময় বুদ্ধকে এড়িয়ে চলতেন। বুদ্ধ জানতেন, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি নন্দাকে ডেকে আনেন। সে সময় বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে নন্দার চেয়ে অপরূপ সুন্দরী নারীকে উপস্থিত করেন। সে নারীর সৌন্দর্য দেখে নন্দা হতভম্ব হয়ে যান। এক দৃষ্টিতে নন্দা চেয়ে রইলেন সেই সুন্দরী নারীর দিকে। বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে সুন্দরী নারীকে পুনরায় বুদ্ধ, জরা, শীর্ণ অবস্থায় পরিণত করলেন। সেই দৃশ্য নন্দার মনে আঘাত করল। তাঁর রূপের মিথ্যা অহংকার নিমেষেই ধ্বংস হয়ে গেল। তখন বুদ্ধ তাঁকে অহংকার পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন; রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি তৃষ্ণামুক্ত হয়ে অর্হত্বপ্রাপ্ত হন এবং উপদেশস্বরূপ বলেন; ‘এই দেহ অশুচি এবং ব্যাধির আলায়। এতে অহংকারের কিছুই নেই। অনির্ঘটক অহংকার পরিত্যাগ করো। মনকে শান্ত ও সংযত করো।’

নন্দার জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে রূপের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। সৎ জ্ঞানই মানুষের পরম সম্পদ।



ধ্যানস্থ ভিক্ষুণী অভিরূপা নন্দা

অনুশীলনমূলক কাজ

রূপ ক্ষণস্থায়ী – বুদ্ধ অভিরূপা নন্দাকে কীভাবে এ শিক্ষা দিলেন? বর্ণনা করো।  
অর্হত্বপ্রাপ্ত হয়ে অভিরূপা নন্দা কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৬

## অতীশ দীপঙ্কর

যুগে যুগে বাংলাদেশে বহু জ্ঞানী পণ্ডিত ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজ গুণে বিশ্বের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। অমর হয়ে আছেন মানুষের মনের মধ্যে। সেই রকম এক মনীষী অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের লোক ছিলেন। ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁর জন্ম। এটি বর্তমানে ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। অতীশের বাস্তুভিটাটি এখনও বিদ্যমান।



অতীশ দীপঙ্কর

বজ্রযোগিনীর সেই ঐতিহাসিক স্থানটিতে অতীশ দীপঙ্করের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি করেছে ‘বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষি প্রচার সংঘ’ নামক একটি সংগঠন। চীনসহ অনেক দেশ থেকে অনেক লোক এই বাস্তুভিটাটি দেখতে আসেন।

অতীশের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী। মাতার নাম প্রভাবতী। জন্মের পর মা-বাবা আদর করে তাঁর নাম রাখেন চন্দ্রগর্ভ। তাঁদের পরিবার ছিল অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনও তাঁর বসতভিটার চিহ্ন রয়েছে। সেখানকার লোকেরা সেই স্থানটিকে বলেন নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা। চন্দ্রগর্ভ শৈশবকাল থেকেই খুবই মেধাবী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। খুব অল্প সময়েই তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র এবং কারিগরি বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জ্ঞান অর্জনের

জন্য চলে গেলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কঠোর অধ্যবসায়গুণে নানা শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। চন্দ্রগর্ত উনত্রিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। একত্রিশ বছর বয়সে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণ দ্বীপে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল শতাধিক শিষ্য। সেখানে তিনি দীর্ঘ বার বছর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

তারপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেশে ফিরে আসেন। তখন বাংলাদেশের রাজা ছিলেন নয়াপাল। রাজার অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে নানারকম অনাচার প্রবেশ করে। তিব্বতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। রাজার ধারণা ছিল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে যেতে পারলে সে দেশের মানুষের প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজার আমন্ত্রণে প্রথম সাড়া দেননি। কিন্তু পরে তিনি রাজি হন। আনুমানিক ১০৪১ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের উদ্দেশে রওয়ানা হন।



অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা

সে সময় তিব্বতে যাওয়ার পথ সুগম ছিল না। অনেক কষ্টে হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। তিব্বত সীমান্তে অপেক্ষারত রাজপ্রতিনিধিরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। তিনি তিব্বতের প্রধান প্রধান শহর, নানা গ্রাম ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হতো। তিব্বতের লোকেরা তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আস্তে আস্তে ফিরে পেল প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা। ধর্মে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল, সেগুলো তারা পরিত্যাগ করল।

বিক্রমশীলা ত্যাগ করার সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বলে গিয়েছিলেন তিব্বতে তিনি মাত্র তিন বছর থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তিব্বতেই থেকে গেলেন। তিব্বতের মানুষকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিব্বতিরাও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতি ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া অনেক বই সংস্কৃত থেকে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিব্বতের এগুথাং বিহারে তাঁকে ‘অতীশ’ উপাধি প্রদান করা হয়। ‘অতীশ’ খুব সম্মানজনক উপাধি। ১০৫৪ সালে তিব্বতের এগুথাং বিহারে ৭৩ বছর বয়সে এই মহাপণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন। অতীশের দেহভস্ম সেই বিহারে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত আছে। ১৯৭৮ সালে চীন থেকে তাঁর দেহভস্মের কিছু অংশ বাংলাদেশে আনা হয়। ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে এগুলো সংরক্ষিত আছে।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি পরিদর্শনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করো (দলীয় কাজ)।

### পাঠ : ৭

#### মনীষীদের জীবনীর অনুসরণীয় দিক

কোনো মহৎ জীবনই সহজে গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে হয়। যাঁরা এরূপ কীর্তিমান জীবন গঠনে সক্ষম হন, তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। যুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁদের আদর্শ ও গুণাবলি অনুশীলন করেন। মহৎ মানুষের জীবনাদর্শে আমাদের অনুসরণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই জীবনীসমূহ পাঠ করে শুধু মানসিক আনন্দ লাভ করলেই হবে না, আদর্শিক দিকগুলোও আমাদের অনুশীলন করতে হবে। আবেগে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। একগ্র অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। গৌতম বুদ্ধ নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণে জীবনকে সুন্দর করার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে বক্কলি নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুবই ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধের জ্যোতির্ময় দেহাবয়বের দিকে ভক্তিচিন্তে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে একসময় তাঁকে ডেকে বললেন; এই ধ্বংসশীল দেহাবয়বের দিকে চেয়ে থেকে ফল কী? নীতি-আদর্শ অনুসরণ করো। আবেগ ত্যাগ করো। নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোক উৎপাদনের বীজ বপন করো। নিজেকে আলোকময় করে গড়ে তোলো। বুদ্ধের এই উপদেশ লাভ করে বক্কলি ঋষি সাধনায় রত হলেন এবং অচিরেই অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা জানা যায়। তখন বুদ্ধ উরুবিল্ব নগরে পরিভ্রমণ করছিলেন। সে সময় উরুবিল্ব বনে বাস করতেন তিনজন ঋষি। উরুবেলাকশ্যপ, নদীকশ্যপ ও গয়াকশ্যপ তিন ভাই। তাঁরা নিজ নিজ শিষ্য নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সেখানে বাস করতেন। তাঁরা কারো নীতি অনুসরণ করতেন না। নিজেদের ধারণা মতে গরমে ও আগুনে তপ্ত হয়ে এবং ঠাণ্ডায় পানিতে ডুবে থেকে দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলে বুদ্ধ তাঁদের উপদেশ দেন।

বুদ্ধ বলেন, পানিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। বুদ্ধ তাঁদের কাছে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আদর্শ ও নৈতিকতার অনুশীলন আবশ্যিক। পরে তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মার্চ্য পালনের মাধ্যমে মুক্তি অন্বেষণে ব্রতী হন।

সুতরাং মহৎ জীবন গঠনের জন্য মহৎ আদর্শের অনুসরণ আবশ্যিক। আমাদের জীবনকে খ্যাতিসম্পন্ন ও জ্যোতির্ময় করার জন্য আলোকিত ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। খের-খেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীরা আদর্শের পথিকৃৎ। তাঁদের জীবনচরিত থেকে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অধ্যবসায়, সংযম ও অনুশীলনীয় নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাঁদের জীবনীর এই অনুসরণীয় দিকগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারলে সকলের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চন্দ্রগর্ভ কত বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন?

ক. ১৬                      খ. ১৯

গ. ২৭                      ঘ. ২৯

৪. উপালি খের'র জীবনী পাঠে-

i. অকুশল কর্মের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়

ii. সূত্র আবৃত্তির শিক্ষা পাওয়া যায়

iii. লোভমুক্ত থাকার উদ্দীপনা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii                      খ. i ও iii

গ. ii ও iii                      ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুভদ্রা তঞ্চঙ্গ্যা রূপে, গুণে ও চরিত্রে অনন্যা। যথাসময়ে তাঁর এক রূপবান যুবকের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর সংসার জীবন অর্প দিন স্থায়ী হয়। পরবর্তী সময়ে মন পরিবর্তন করে তিনি বিহারমুখী হন এবং ব্রহ্মার্চ্য পালনে সচেষ্ট হন। ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঢাকা জেলার পাশ্চবর্তী এক জেলায় এক মণীষীর জন্মলাভ হয়। জ্ঞান গরিমা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি দেশে বিদেশে অনেক সুনাম অর্জন করেন।

৩. সুভদ্রা তঞ্চঙ্গ্যার সাথে পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. মহাপ্রজাপতি গৌতমী                      খ. কৃষা গৌতমী

গ. অভিরূপা নন্দা                      ঘ. ক্ষমা

### ৪. বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে উদ্দীপকে দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত মনীষী-

- i. সুদূর দুর্গম তিব্বত গমন করেন
- ii. যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন
- iii. সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুপলা বড়ুয়ার স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। একদিন তিনি স্বামী সন্তানদের নিয়ে তার বাবার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি বেঁচে গেলেও তার স্বামী ও সন্তানেরা মারা গেলো। স্বামী সন্তান হারিয়ে সুপলা দিশেহারা হয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা প্রার্থনা করেন।

ক. কৃশা গৌতমী কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন?

খ. মৃত ছেলেকে নিয়ে কৃশা গৌতমী কার কাছে গিয়েছিলেন এবং কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় চরিতমালার কার জীবনের ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুপলার অনসৃত পথে কী নির্বাণ লাভ সম্ভব? যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. একদিন বুদ্ধসভায় আলোচনাকালে বুদ্ধ এব অভিনব ও অলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করলেন। তিনি স্বর্গের অপূর্ব এক সুন্দরী পরীকে সকলের সামনে উপস্থাপন করলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে সেই পরীকে দেখতে লাগলেন। বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী সেই পরী ক্রমাগত যৌবন থেকে মধ্য বয়সে এবং তারপর বার্ধক্যে উপনীত হলো। তার সৌন্দর্য কোথায় হারিয়ে গেলো! একসময় সে মুখ খুবরে মাটিতে পড়ে গেলো।

ক. বুদ্ধের সেবক কে ছিলেন?

খ. পূর্ণকে আগে প্রব্রজ্যা দেওয়া হলো কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. বুদ্ধ উদ্দীপকের কাহিনি চরিতমালার কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এ দেহ অশুচি এবং ব্যাধির আলায়'-উদ্দীপকের আলোকে বুদ্ধের এ উক্তির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্হত্বপ্রাপ্ত হয়ে অভিরূপা নন্দা কী বলেছিলেন?
২. রাজকুমারগণ আগে উপালিকে প্রব্রজ্যা দিতে বলেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. বুদ্ধ কেন আনন্দ থেরকে তাঁর প্রধান সেবক হিসেবে নিযুক্ত করেন?
৪. কৃশা গৌতমীর উপদেশ কী কী?
৫. আনন্দ থের'র দু'টি উপদেশ লেখো।

## নবম অধ্যায়

### জাতক

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনিগুলো জাতক নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে জাতকের গল্প ও উপদেশগুলোর প্রভাব অপরিসীম। জাতকের গল্পের শেষে যে উপদেশ থাকে, তা থেকে আমরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারি। এছাড়া জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভূগোল, পরিবেশ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কেও জানা যায়। তাই জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা জাতক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* জাতক সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- \* জাতক কাহিনী বর্ণনা করতে পারব;
- \* জাতকের উপদেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ : ১

#### জাতক পরিচিতি ও জাতকের সংখ্যা

জাতক শব্দটি ‘জাত’ শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে। ‘জাত’ শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভূত, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং জাতক শব্দের অর্থ যিনি উৎপন্ন বা জন্ম লাভ করেছেন। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে শিষ্যদের তাঁর অতীত জন্মের কাহিনি বর্ণনা করতেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঐ কাহিনিগুলোকে জাতক বলা হয়। এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বুদ্ধ হওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করে পরিশুদ্ধিতা অর্জন করতে হয়। জাতক পাঠে জানা যায়, জন্ম-জন্মান্তরে গৌতম বুদ্ধ নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানবকুলে রাজা, মন্ত্রি, ব্রাহ্মণ, বণিক, এবং দেবকুলসহ বিভিন্ন পশু-পাখি হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রতিটি জন্মে তিনি ‘বোধিসত্ত্ব’ নামে অভিহিত হন। বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন। এক কথায় বলা যায়, গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বরূপে অতীত জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনাবলিসমূহ ‘জাতক কাহিনী’ নামে খ্যাত।

মূলত জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। গৌতম বুদ্ধ ৫৫০তম জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করে ‘বুদ্ধ’ নামে অভিহিত হন। শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৪৪৭টি জাতক কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, ৩টি জাতক কাহিনি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ  
‘জাতক’ শব্দের অর্থ কী?  
জাতকের শিক্ষা ব্যাখ্যা করো।

## পাঠ : ২

### নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব

সৎ এবং সুন্দর পথে পরিচালিত জীবনই হলো আদর্শ জীবন। আদর্শবান ব্যক্তি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। মৃত্যুর পরও নীতিবান এবং আদর্শবান ব্যক্তির কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত নৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। কেননা নীতি-আদর্শহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আদর্শ ও নৈতিক জীবন কীভাবে গঠন করতে হয়, তা জাতক পাঠে জানা যায়।

জাতকের গল্পগুলো হিতোপদেশমূলক। এগুলো রূপকথার গল্প নয়। ভগবান বুদ্ধ ভালো কাজের সুফল এবং খারাপ কাজের কুফল বোঝানোর জন্য জাতক কাহিনিগুলো বলতেন। তাই সুন্দর মানবজীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক কাহিনিগুলো ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুঝতে সাহায্য করে। ভালো কাজে উৎসাহ জোগায়। উদার চিন্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। শীলবান বা চরিত্রবান, দয়াবান, নীতিবান, সত্যবাদী, ক্ষমাপরায়ণ, মৈত্রীপরায়ণ এবং পরোপকারী হতে শিক্ষা দেয়। প্রানী হত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। কায়, বাক্য এবং মন সংযত করে। সম্যক জীবিকা অবলম্বন করতে উৎসাহ জোগায়। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। পরমতসহিষ্ণু এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। বলা যায়, নৈতিক এবং আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। তাই প্রত্যেকের জাতকের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

## পাঠ : ৩

### কপোত জাতক

পুরাকালে বারাণসিরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পায়রারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারাণসির লোকেরা পুণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা জায়গায় বুড়ি বুলিয়ে রাখত। পায়রারূপী বোধিসত্ত্ব সে রকম একটি বুড়িতে রাতে থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। খাবার খেয়ে সন্ধ্যার সময় সেই বুড়িতে এসে শয়ন করতেন।

একদিন এক কাক সেই ঘরের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় রান্নার চমৎকার গন্ধ পেল। সে উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে মাছ-মাংস রান্না হচ্ছে। লোভী কাক বাইরে বসে ভাবতে লাগল, কেমন করে ঐ মাছ-মাংস খাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় পায়রাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে ভাবল, পায়রাটার সঙ্গে ভাব করেই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

পরদিন ভোরে বোধিসত্ত্ব ঘুম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কাকও তাঁর পেছন পেছন ছুটল। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে চললে কেন?' কাক বলল, 'আপনার চালচলন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকব।'



### পাচক ও লোভী কাক

তারপর থেকে কাকটি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে থাকতে লাগল। পাচক দেখল, পায়রার সঙ্গে একটি কাক এসে থাকছে। তাই সে কাকের জন্যও একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিল। সেই থেকে কাকটিও সেই বাড়িতে থাকতে লাগল। একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে প্রচুর মাছ-মাংস রান্না হচ্ছিল। তা দেখে কাকের খুব লোভ হলো। সে ঠিক করল পরদিন সে খাবার খুঁজতে বাইরে যাবে না। এই ভেবে সে সারা রাত অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইল। সকালে সে ঠিক করল, পায়রার সঙ্গে খাবার খেতে বাইরে যাবে না। বোধিসত্ত্বের মনে সন্দেহ হলো। তাই তিনি কাককে বললেন, ‘বেশ, তুমি থাকো। তবে সাবধান লোভে পড়ে কোনো কিছু করে বসো না।’ কাককে উপদেশ দিয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের খাবার খুঁজতে চলে গেলেন।

এদিকে পাচক রান্না শুরু করল। রান্নার হাঁড়ি থেকে বাষ্প বেরোনোর জন্য হাঁড়ির মুখ একটু খোলা রাখল। একটা হাঁড়ির মুখ ঝাঁঝরি দিয়ে ঢেকে দিল। রান্নার সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ সময় পাচক গায়ের ঘাম শুকানোর জন্য রান্নাঘরের বাইরে বারান্দায় গেল। কাক ঠিক সে সময় ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁড়ির ওপর ঝাঁঝরিতে গিয়ে বসল। তখনই ঝাঁঝরিটা মাটিতে পড়ে ঝন্ঝন্ শব্দ হলো। পাচক সেই শব্দ শুনে রান্নাঘরে ছুটে এল।

এসে দেখল, কাক মাংস খাওয়ার চেফটা করছে। পাচক সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কাকটিকে ধরে ফেলল। এরপর সারা শরীরের পালক তুলে নিয়ে গায়ে আদা ও নুন মেখে দিল। তারপর তাকে বুড়ির মধ্যে ফেলে রাখল। যন্ত্রণায় কাক ছটফট করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যায় ফিরে এসে কাককে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, লোভী কাক আমার কথা না শোনায়ে এই ফল পেয়েছে। তারপর তিনি একটি গাথা বললেন। গাথাটির অর্থ হলো :

‘উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না। এ জন্য তার ওপর বিপদ নেমে আসে। কাক তার প্রমাণ।’

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করে নিজে নিজে বললেন, আমি আর এখানে থাকতে পারি না। তারপর তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কাক সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। পাচক বুড়িসহ কাকটি ফেলে দিল।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

### অনুশীলনমূলক কাজ

কাক কেন পায়রার সাথে বন্ধুত্ব করল?  
ধূর্ত কাকের পরিণতি বর্ণনা করো।

## পাঠ : ৪

### শশক জাতক

অতীতকালে বারাণসি রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শশককুলে জন্মগ্রহণ করে এক বনে বাস করতেন। ঐ বনের একদিকে পর্বত, একদিকে নদী এবং একদিকে গ্রাম। শশকরূপী বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। শিয়াল, বানর ও উদ্বিড়াল। চার বন্ধু বাস করত গঙ্গা নদীর তীরে। শশক ছিলেন খুব পণ্ডিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুকে ‘দান করা উচিত’, ‘শীল রক্ষা করা উচিত’, ‘উপোসথ পালন করা উচিত’ - এরূপ ধর্মোপদেশ দিতেন। বন্ধুরা উপদেশসমূহ গ্রহণ করত। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

একদিন শশক চাঁদ দেখে বুঝলেন, পরদিন পূর্ণিমা। বন্ধুদের বললেন, ‘আগামীকাল পূর্ণিমা। তোমরা শীল গ্রহণ করে উপোসথ পালন করো। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করো। শীলবান ব্যক্তির দান মহাফলদায়ক। কোনো যাচক উপস্থিত হলে তোমরা নিজের খাবারের অংশ হতে তাকে খাবার দেবে।’

উপদেশ শুনে বন্ধুরা খাবারের খোঁজে বের হলো।

শিয়াল এক বাড়িতে ঢুকল। সে দেখল এক হাঁড়ি মাংস, মিষ্টি ও এক ভার দই বারান্দায় পড়ে আছে। সে উচ্চ স্বরে তিনবার হাঁক দিল - এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে ঐ সব দ্রব্য নিয়ে গর্তে ফিরে এল এবং ‘বেলা হলে আহাং করব’ এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

ওদিকে উদ্‌বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাছের গন্ধ পেল। বালি খুঁড়ে সে চারটি মাছ বের করল। সে-ও তিনবার বলল- এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে মাছগুলো গর্তে নিয়ে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’-এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

বানরও বন থেকে একগুচ্ছ আম পেড়ে নিয়ে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’-এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।



শশকরূপী বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের উপদেশ দিচ্ছেন

এদিকে বোধিসত্ত্ব তৃণ ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন, ‘আমার খাবার তো ঘাস। মানুষ ঘাস খায় না। আমার কাছে কোনো যাচক উপস্থিত হলে তাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করব’।

তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের শরীরের মাংস আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শশকের মহাসংকল্পের কথা জানতে পারলেন। দান পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সবার দান গ্রহণ করলেন। অবশেষে শশকের কাছে এলেন। শশক তাঁকে দেখে খুব খুশি। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে বললেন, ‘আপনি আহারের জন্য আমার কাছে এসে উত্তম কাজ করেছেন। আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা আগে কেউ কখনো দান করেনি। আপনি আগুন জ্বালুন। আমি তাতে বাঁপ দেব। আগুনে আমার শরীর সিদ্ধ হলে আপনি সেই মাংস খেয়ে শ্রামণ্য ধর্ম পালন

করবেন।' ইন্দ্র খড়্‌কুটো দিয়ে আগুন জ্বালালেন। শশকরূপী বোধিসত্ত্ব তিনবার গা ঝাড়া দিলেন। পোকা-মাকড় থাকলে যাতে শরীর থেকে পড়ে যায়। তারপর নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য আগুন তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করল না। শশক ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ! তোমার আগুন এত শীতল কেন?

ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে শশক! আমি ইন্দ্র। তোমার দান পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছি। শশক বললেন, হে দেবরাজ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই আমার দান পরীক্ষা করুক। আমাকে কখনো দানবিমুখ দেখবে না।

ইন্দ্র বললেন, 'শশক, তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।' দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রমহলে একটি শশকচিহ্ন এঁকে দিলেন। সে কারণে আজও আমরা চাঁদে একটি শশকের চিহ্ন দেখি।

উপদেশ : শীলবান ব্যক্তির সর্বত্র পূজিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ  
শশকের বন্ধু কারা?  
শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হয়- ব্যাখ্যা করো।

## পাঠ : ৫

### আম্রজাতক

পুরাকালে বারাণসি রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তার রাজত্বকালে উদীচ্য ব্রাহ্মণকূলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বয়োঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্ব ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন।

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় শুকিয়ে গেল। চারদিকে পানীয় জলের বড় অভাব। তৃষ্ণায় পশুপাখি সব কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। পশুপাখিদের এই যন্ত্রণা দেখে এক ভিক্ষুর মায়া হলো।

ভিক্ষু একটা গাছ কাটলেন। সেই গাছের ডাল দিয়ে একটা ডোঙ্গা তৈরি করলেন। ডোঙ্গাটি জলপূর্ণ করে তিনি পশুপাখিদের জলপানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বনের সব পশুপাখি এসে সেই ডোঙ্গা থেকে জলপান করতে লাগল। এতে অসংখ্য জীবের প্রাণ রক্ষা পেল।

প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী জলপান করতে আসতে লাগল। ফলে ভিক্ষু আহারের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করার সময় পেতেন না। ভিক্ষু তার নিজের আহারের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত প্রাণীদের তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। এটা দেখে পশুপাখিরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ভিক্ষু অনাহারে থেকে কষ্ট ভোগ করছেন। তারা ঠিক করল, এবার থেকে যে প্রাণী যখন জলপান করতে আসবে, তখন তার সাধ্য অনুসারে ভিক্ষুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে।



প্রাণীরা জলপান করছে

এরপর থেকে প্রতিটি পশুপাখি নিজের সাধ্যমতো আম, জাম, কাঁঠাল, মধুর, অমধুর প্রভৃতি ফল নিয়ে জলপান করতে আসতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, আশ্রমের পাঁচশ ভিক্ষুও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

সৎ কাজে ভিক্ষুটির এই আত্মোৎসর্গ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘দেখো, সৎ কাজের কী অদ্ভুত মহিমা! একজনের ব্রতের ফল কতজন ভিক্ষু ভোগ করছে। তাদের কাউকে আর ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কষ্ট করে বনে যেতে হচ্ছে না।’

**উপদেশ :** কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভিক্ষু কেন প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন?

পাঠ : ৬

## মশক জাতক

পুরাকালে বারণসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করতেন। তখন কাশী রাজ্যের এক গ্রামে অনেক সূত্রধর বাস করত। তারা কাঠ দিয়ে নানারকম আসবাব তৈরি করত। সেখানে একদিন এক বৃদ্ধ সূত্রধর কাঠ কেটে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করছিল। পাশে তার পুত্র বসে ছিল। এমন সময় এক মশক তার মাথায় বসে সুঁচালো হুল ফুটিয়ে দিল। সে পুত্রকে ডেকে বলল, ‘বৎস, আমার মাথায় মশক হুল ফুটিয়ে রক্ত পান করছে। তুমি মশকটি তাড়িয়ে দাও।’ পুত্র বলল, ‘বাবা, আপনি স্থির থাকুন। আমি এক আঘাতেই মশকটি মেরে ফেলব।’ ঐ সময় বোধিসত্ত্ব পণ্যসম্ভার নিয়ে বৃদ্ধ সূত্রধরের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। তিনি বাড়ির সামনে বসলেন। তিনি বসলে সূত্রধর আবার বলল, ‘বৎস, মশকটি তাড়িয়ে দাও।’ তখন তার ছেলে ‘তাড়াচ্ছি’ বলে এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার কুঠার উত্তোলন করল এবং পিতার পেছন দিক থেকে ‘মশা মারি’, ‘মশা মারি’ বলতে বলতে বৃদ্ধের মাথায় জোরে আঘাত করল। সাথে সাথে বৃদ্ধের মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল এবং বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বোধিসত্ত্ব এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে

গেলেন। তিনি ভাবলেন, এত নির্বোধ লোক কোথাও দেখিনি। এরূপ মূর্খের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও অনেক ভালো। কারণ যিনি বুদ্ধিমান তিনি শান্তির ভয়ে মানুষ হত্যা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ছেলোটো এতই মূর্খ যে মশা মারতে গিয়ে নিজের বাবাকে মেরে ফেলল।

মূর্খ ছেলের এই কাজ দেখে বোধিসত্ত্ব একটি গাথা আবৃত্তি করে সে স্থান ত্যাগ করলেন। গাথাটি হলো :

বুদ্ধিমান শত্রু সেও মোর ভালো  
নির্বোধ মিত্রে কী কাজ?  
মশক মারিতে বধিল পিতারে  
মহামূর্খ পুত্র আজ।

উপদেশ : মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

অনুশীলনমূলক কাজ  
সূত্রধর কী কাজ করছিল?

## পাঠ : ৭

### জাতকের উপদেশসমূহ অনুসরণের সুফল

‘জাতক’ হলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু জাতকগুলোতে অনুসরণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। এসব উপদেশ মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এসব উপদেশ অনুসরণ করা একান্ত উচিত। নিচে জাতকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় উপদেশ তুলে ধরা হলো। যেমন : কপোত জাতক পাঠে আমরা লোভের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ শিক্ষামতে, অতিরিক্ত লোভ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। তাই সকলের লোভ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে শশক জাতকে শীল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ জাতকের উপদেশ মতে, শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। আম্রজাতক কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যমশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। মশক ও রোহিণী জাতকে মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো বলে নির্দেশনা রয়েছে।

জাতকগুলোতে এরূপ অনেক উপদেশ পাওয়া যায়, যা নির্বুদ্ধিতা, কৃপণতা, অলসতা, অহংবোধ, ধূর্ততা ইত্যাদি বর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এসব উপদেশ আমাদের অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদনের প্রেরণা যোগায়। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীপরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। তাই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতকের উপদেশ অনুসরণ অপরিহার্য।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

#### ১. পায়রারূপী বোধিসত্ত্বের অনুচর হিসেবে কে থাকত?

ক. মশক      খ. কাক      গ. বানর      ঘ. শশক

## ২. জাতক কাহিনীর শিক্ষা গ্রহণে-

- অকুশল কর্মের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়
- উঁচু-নিচু সকল জাতের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মায়
- সৎপথে জীবিকা নির্বাহে উৎসাহিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তরুণ চাকমার ছেলে বিমল চাকমা একেবারে অকর্মণ্য ও বোকা। এ ছেলে কোনো কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। উপরন্তু তার অপরিণামদর্শী কাজের কারণে তরুণ চাকমা প্রায়ই মারাত্মক বিপদে পড়েন। অপরদিকে গ্রামের যুবক ছেলে অভিরূপ চাকমা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পরোপকারী। তার খরা আক্রান্ত এলাকায় পানির অভাব দূর করার জন্য নিজ খরচে বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল বসিয়ে স্থাপন করেন।

৩. তরুণ চাকমার চরিত্রের সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে?

- ক. কপোত জাতক      খ. আম্র জাতক      গ. মশক জাতক      ঘ. শশক জাতক

৪. অভিরূপ চাকমার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উপদেশটির সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু      গ. শীলবান ব্যক্তিগণ সর্বত্র পূজিত হয়  
খ. মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো      ঘ. কুশল কাজে সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১: মহেশখালীর নিচু জায়গায় গতবছর বর্ষা ও অতিবৃষ্টিতে নলকূপগুলো ডুবে যায়। এতে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দেখে ব্যবসায়ী মানিক বড়ুয়ার মায়া হয়। তিনি এলাকায় দ্রুত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ঘটনা-২: কৃষকের নিকট থেকে স্বল্পমূল্যে আলু কিনে ব্যবসায়ী সুমন বড়ুয়া তা কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করলেন। কিন্তু তিনি যথাসময়ে আলু বাজারে ছাড়লেন না। অধিক দামে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি এবং তার মতো এলাকার কিছু ব্যবসায়ী বাজারে আলুর কৃত্রিম সংকট তৈরি করলেন। কিন্তু বিদ্যুত গ্রীডে সমস্যার কারণে তার এলাকায় বিদ্যুত সরবরাহ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় কোল্ড স্টোরেজের আলুতে পচন ধরল।

ক. চার বন্ধু কোথায় বাস করতো?

খ. অনৈতিক কাজ করা উচিত নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. মানিক বড়ুয়ার সাথে জাতকের কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ২য় ঘটনায় উপদেশ বাণী কী হতে পারে? জাতকের সাথে সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ভিক্ষু কীভাবে প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করলেন?
- শশক তাঁর বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিতেন?
- জাতকের উপদেশসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো।
- মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো কেন? ব্যাখ্যা করো।
- শশক জাতকের উপদেশটি ব্যাখ্যা করো।

## দশম অধ্যায়

# বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবের। কালের পরিক্রমায় এগুলো ধ্বংসসত্বপে পরিণত হয়েছে। খননকার্যের ফলে এসব ধ্বংসসত্বপ থেকে প্রাচীন অনেক মূল্যবান নিদর্শন ও প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের অনেক কীর্তি জড়িত আছে। বাংলাদেশ সরকার এসব ধ্বংসসত্বপ ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করছে। এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধমূর্তি ও চৈত্য আছে। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এগুলো দেখতে আসে। তাই এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। এগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। এসব স্থান বৌদ্ধদের নিকট খুবই পবিত্র এবং প্রিয়। এগুলো দর্শন করলে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- \* বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিতে পারব;
- \* বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

### বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান পরিচিতি

বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলোর মধ্যে বিহার, চৈত্য, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দেব-দেবীর মূর্তি, সত্বপ, প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও নগরের ধ্বংসাবশেষ, ব্যবহার্য দ্রব্য, পোড়ামাটির ফলক, চিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতিতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শালবন মহাবিহার, আনন্দবিহার, ভোজবিহার, রূপবান বিহার, ইটাখোলা বিহার, কোটিল্যামুড়া, কোটবাড়ীমুড়া, চারপত্রমুড়া, ত্রিরত্নমুড়া উল্লেখযোগ্য। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাস্থানগড়, ভাসুবিহার, গোবিন্দভিটা, বৈরাগীর ভিটা অন্যতম। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের আবিষ্কৃত সর্ববৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। এছাড়া এ অঞ্চলে হলুদ বিহার, জগদল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। দিনাজপুরে সীতাকোট বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সম্প্রতি নরসিংদী জেলায় উয়ারী-বটেশ্বর, পঞ্চগড়ে পদ্মবিহার, এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুরে বিক্রমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের অতীত ঐতিহ্যের স্মারক। বাংলাদেশ সরকার এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। এসব বৌদ্ধ ঐতিহ্য দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক পর্যটকের সমাগম হয়।

আধুনিককালে নির্মিত অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধমূর্তি আছে, যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। বৌদ্ধবিহারগুলোর মধ্যে পাহাড়তলীর মহামুনি বিহার, রাউজানের সুদর্শন বিহার, বাগোয়ানের ফরাচিন বিহার, পটিয়ার সেবাসদন বিহার, ঠেগরপুনির বুড়া গোসাই বিহার, চক্রশালা বিহার, রামুর রামকোট বিহার, কক্সবাজারের অগ্গমেধা বিহার, রাঙামাটির চিৎমরম বিহার, রাজবন বিহার, সীতাকুণ্ডের সঞ্জারাম বিহার, খাগড়াছড়ির পানছড়িতে অবস্থিত অরণ্য কুটির বিহার, ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এসব বিহারে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য

স্থাপনার নির্মাণশৈলী খুবই চমৎকার। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনি বিহারের দেয়ালে অঙ্কিত আছে, যা আকর্ষণীয় এবং দর্শনাধীর্ মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে। দেড় শ বছর আগে ঠেগরপুনি গ্রামের পুকুরে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি পুকুর থেকে উদ্ধার করার জন্য হারাধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীলমনি বড়ুয়া স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হন। তাঁর স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে জানা যায়। এই মূর্তির নিকট যদি কেউ কুশলচিন্তে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তার সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে চিংমরমের বুদ্ধমূর্তি, মহামুনি বুদ্ধমূর্তি, বাগোয়ানের ফরাচিন মূর্তিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে। তাই অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ যেকোনো শুভকাজ আরম্ভ করার আগে এসব বিহারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিহারগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এসব বিহার প্রাক্ষণে বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে মেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে এসব স্থানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও বুদ্ধমূর্তি আছে। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

### অনুশীলনমূলক কাজ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের তালিকা তৈরি করো (দলীয় কাজ)।  
আধুনিক কালের দশটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখো।

## পাঠ : ২

### ময়নামতি

কুমিল্লা জেলার কেন্দ্রস্থল থেকে আট মাইল দূরে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এবং প্রায় এগারো মাইল বিস্তৃত। এই পাহাড়গুলো অতীতে বৌদ্ধবিহার, ও স্তূপ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এ সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। সে সময় এগুলো ঢিবি আকারে ছিল। স্থানীয় লোকেরা এসব ঢিবি থেকে ইট সংগ্রহ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুমিল্লা বিমানবন্দর তৈরির সময় ঠিকাদাররাও এসব ঢিবি থেকে ইট সংগ্রহ করত। ফলে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু নষ্ট ও হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সরকার ২০টি নিদর্শনকে প্রাচীন কীর্তি রক্ষা আইনে সংরক্ষিত করেছে। তার মধ্যে ময়নামতি অন্যতম। এখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে খননকাজ চালানো হয়। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, বুদ্ধমূর্তি, স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা, মৃৎফলক, আসবাবপত্র এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এখানে পালবংশ, খড়্গবংশ, চন্দ্রবংশ, দেববংশ প্রভৃতি বংশের বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বৌদ্ধ রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতি অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ বিহার চৈত্য স্তূপ প্রভৃতি নির্মিত হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ময়নামতি ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যাচর্চার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে আসতেন।

### শালবন মহাবিহার

কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার হলো শালবন মহাবিহার। খননকার্যের ফলে শালবন মহাবিহারের ধ্বংসস্তুপে একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। সেই তাম্রলিপি হতে জানা যায় যে, শালবন মহাবিহারটি রাজা ভবদেব নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দেববংশের রাজা আনন্দদেবের পুত্র। অষ্টম শতাব্দীর দিকে দেববংশ এ অঞ্চল শাসন করতেন। উক্ত বিহারের ধ্বংসাবশেষ হতে বোঝা যায়, বিহারটি ছিল বর্গাকৃতির। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। বিহারের চারদিক দেয়ালবেষ্টিত। দেয়ালের উচ্চতা সাড়ে ১৬ ফুট।



শালবন মহাবিহার

এই বিহারে ১১৫টি কক্ষ ছিল। সব কক্ষই সমান। কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। একটি কক্ষ থেকে অপর কক্ষ ৫ ফুট পুরু দেয়াল দিয়ে পৃথক করা। উত্তর দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। বিহারে প্রবেশের সিঁড়িও উত্তর দিকে ছিল। মূল বিহারটি ক্রুশ আকৃতির। এটি ইট নির্মিত এবং বিহার অঙ্গানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট, প্রস্থে ১১০ ফুট। বিহারকে বেষ্টিত করে ৭ ফুট চওড়া প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। বিহার গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির ফলকচিত্রে অলংকৃত ছিল।

বিহারাজগনে আরো অনেক স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্তম্ভবিশিষ্ট একটি হলঘর আছে। কেন্দ্রীয় বিহারের পশ্চিমে দুটি ছোট মন্দির আছে। বিহারের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ৬০ ফুট দূরে বর্গাকৃতির একটি চার কোনাকার বিহার আছে। পূজাকক্ষ বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

খননের ফলে এখানে বহু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৮টি তাম্রলিপি, স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা, অলংকার, ব্রোঞ্জের বুদ্ধ, ও বোধিসত্ত্বমূর্তি, নানা দেব-দেবীর মূর্তি, পোড়ামাটির অসংখ্য ফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তরমূর্তি, তামার পাত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলো খুবই সুন্দর এবং মূল্যবান।

শালবন মহাবিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এই বিহারে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিহারের খুব সুখ্যাতি ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন। দেববংশ, চন্দ্রবংশ ও পালবংশের রাজারাও এই বিহারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিহারটি চার শ বছর টিকে ছিল।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?

ময়নামতিতে কখন বৌদ্ধ নিদর্শনগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল?

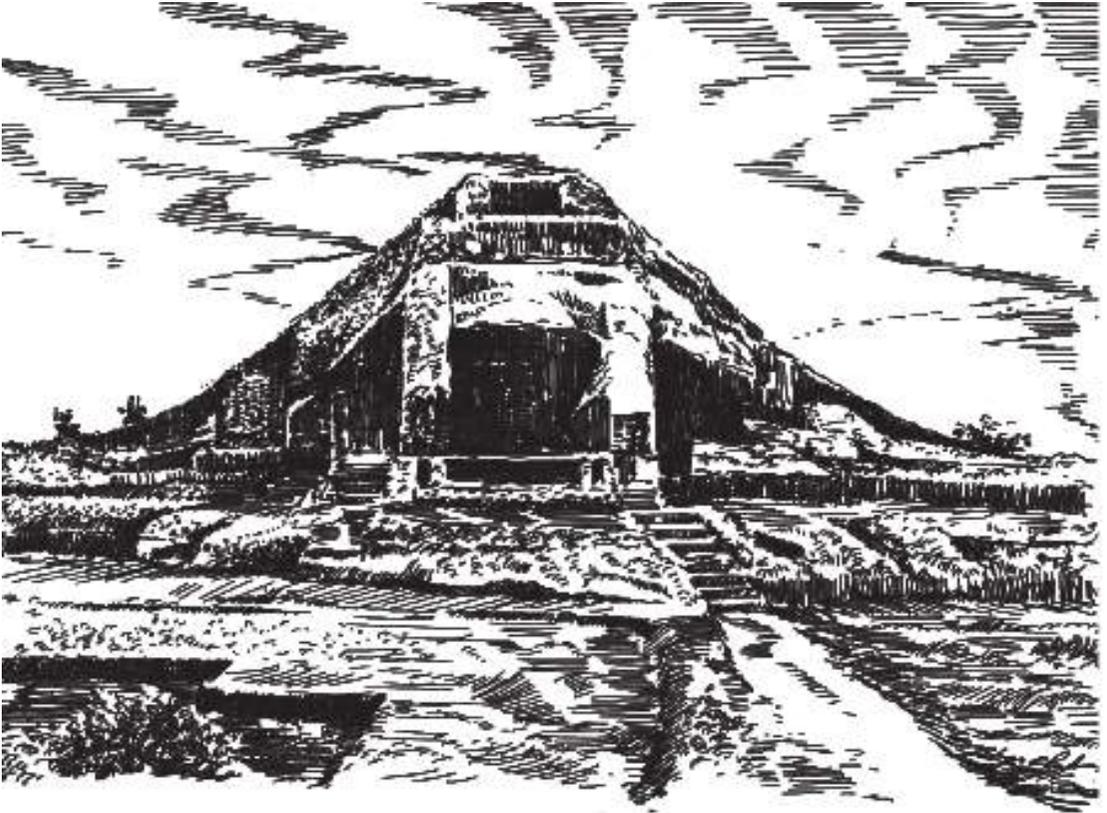
শালবন মহাবিহারে যেসব জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

শালবন মহাবিহারের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

## পাঠ : ৩

## পাহাড়পুর

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে নওগাঁর বদলগাছী থানায় পাহাড়পুর অবস্থিত। পাল বংশের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করতেন। এ অঞ্চলটি বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। পাল বংশের রাজা ধর্মপাল এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটির নাম 'সোমপুর মহাবিহার'। এটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার। এই বিহারের জন্য পাহাড়পুরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিচে সোমপুর মহাবিহারের পরিচয় তুলে ধরা হলো।



## সোমপুর মহাবিহার

## সোমপুর মহাবিহার

খননকার্যের ফলে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বিহারটি বর্গাকৃতির। প্রায় ২৭ একর জমিজুড়ে বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। বিহারের চারদিক ইটের প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বিশাল বিহারটি দুর্গের মতো দেখায়। এতে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য ১৭৭টি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলোতে কোনো জানালা ছিল না। তবে দেয়ালের মধ্যে কুলুঙ্গি ছিল। সব কটি কক্ষ একই মাপের (১৪ × ১৩ ফুট)। প্রতিটি কক্ষে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। বিহারাজ্ঞানে অসংখ্য নিবেদন স্তূপ, ছোট ছোট মন্দির, পুষ্করিণী এবং অন্যান্য স্থাপনা ছড়িয়ে আছে। বিহারের কেন্দ্রস্থলে ক্রুশ আকৃতির সুউচ্চ একটি মন্দির আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এর ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয়েছে।

বিহারের প্রধান প্রবেশপথ উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রবেশপথ ছিল বেশ বিস্তৃত। বিহারের দেয়ালগাত্র পোড়ামাটির অপূর্ব ফলক চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল। সহজ-সরল গ্রামীণ শিল্পীরা মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি করেছিল। এগুলো ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ চিত্র। এগুলোর শিল্পমান অনন্যসাধারণ।

রাজা ধর্মপাল এ বিহারকে কেন্দ্র করে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে খননকার্যের ফলে বহু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্র নির্মিত দ্রব্য, আসবাবপত্র আবিষ্কৃত হয়।

মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করেন। পরে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে ধর্ম প্রচার এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এটি শুধু বৌদ্ধবিহারই ছিল না, বিদ্যাপীঠও ছিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। দেশি-বিদেশি পণ্ডিতগণ এই বিহারে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। বহির্বিশ্বেও এ বিহারের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউনেস্কো পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারকে ‘বিশ্ব ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

সোমপুর মহাবিহার অঙ্কনে অবস্থিত স্থাপনাগুলোর তালিকা তৈরি করো। (দলীয় কাজ)।

সোমপুর মহাবিহারে প্রাপ্ত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করো।

### পাঠ : ৪

#### রামকোট বিহার

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় রামকোট বিহার অবস্থিত। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু’ই কিলোমিটার পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা বিহারটি দেখতে খুবই সুন্দর। বিহারের ফটকে ‘রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার’ লেখা রয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে এটিকে সবাই রামকোট বনাশ্রম নামেই জানে। পণ্ডিত, গবেষক ও বিভিন্ন ইতিহাসবিদের মতে, এ বিহার সম্রাট অশোকের সময়ে বা তার পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্য মতে, এখানে বুদ্ধের বক্ষাস্থি রক্ষিত আছে। তাই এর নাম রাংকুট হয়েছে।



রামকোট বিহারের প্রবেশপথ

সতেরোটি ছোট বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বিহারটি পরিবেষ্টিত। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে চারদিকে ছড়ানো বহু প্রাচীন ইটের টুকরো, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বিহারটির চূড়ার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এই অসাধারণ নির্মাণ কাজের জন্য বিহারটি অন্যতম বৌদ্ধ নিদর্শন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। রামকোট বিহারের দক্ষিণ পাশের অন্য একটি ছোট পাহাড়ের স্তূপ থেকে একটি মূল্যবান শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সেটি ডাকাত দল লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই মূল্যবান শিলালিপিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্তূপটিও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। জানা যায়, ১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাথের নামে মিয়ানমারের (আগের বার্মা) এক ভিক্ষু শ্রীলংকায় একখানি শিলালিপি উদ্ধার করেন। সেই শিলালিপির বর্ণনা মতে এখানে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালানো হয়। খননকাজের ফলে বৃহৎ সজ্জারামটির ধ্বংসাবশেষ ও পাথরে নির্মিত সুদৃশ্য বৃহদাকার অভয়মুদ্রার একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন এ বুদ্ধমূর্তিটি এখনও রামকোট বিহারে সংরক্ষিত আছে। বিহারের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় বেলে পাথরে নির্মিত ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তিটি অন্যতম।

বিহারটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে সবচেয়ে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থলটি আনুমানিক ৩০ ফুট উঁচু একটি টিলার ওপর অবস্থিত। গঠন প্রণালি বিবেচনা করে এটি একটি বিশাল সজ্জারাম ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই বিহারটি চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের সম্পর্ক ও সংস্কৃতি বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে বিহারটিতে ‘অরিয়ধর্ম’ নামে একটি পাঠাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা ছয়শর অধিক। পাঠাগারটি সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।

এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ একটি রম্যবতী নগরী ও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যময় গৌরবগাথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ বিহারস্থ ভিক্ষু ও শ্রমণদের ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন। বিহারে অবস্থিত বৃহৎ বুদ্ধমূর্তিটি দর্শন করার জন্য দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক এখানে আসেন। খননকার্য চালানো হলে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

### অনুশীলনমূলক কাজ

রামকোট বিহার কোথায় অবস্থিত?  
রামকোট বিহারের গঠনশৈলী বর্ণনা করো।

পাঠ : ৫

## রাজবন বিহার

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা শহরের একটি প্রসিদ্ধ বিহার হলো রাজবন বিহার। এটি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারটি অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিহারের মনোরম এলাকায় পশুপাখি নির্ভয়ে বিচরণ ও চলাচল করে। শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। গভীর অরণ্যে ভাবনা করায় তিনি ‘বনভন্তে’ নামেই অধিক পরিচিত। বাংলাদেশি বৌদ্ধরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি চাকমা রাজপরিবার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে রাঙামাটি জেলার লংগদু থেকে এ বিহারে আগমন করেন। রাজপরিবার কর্তৃক দানকৃত জমিসহ রাজবন বিহারের মোট আয়তন ৪৭ একর। বিহারে উপাসনা মন্দির, চৈত্য, ভিক্ষুশালা, দেশনাঘর, চংক্রমণ কুটির, ভিক্ষুসীমা, ভোজনালয়, পাঠাগার, জাদুঘর, বয়নশালা, ভিক্ষু উপগুপ্তের মূর্তি,



রাঙামাটির রাজবন বিহার

সপ্তস্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি রয়েছে। বিহারটির নির্মাণশৈলী অপূর্ব। পার্বত্য চট্টগ্রামে বন বিহারের ষাটের অধিক শাখা আছে এবং বনভন্তের শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ধৃতাজশীল পালন করেন। বৌদ্ধদের নিকট এই বিহারটি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। এ তীর্থস্থানে প্রতিদিন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে জনগণ এই বিহারে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এ বিহারে সন্তানের অন্নপ্রাশন, সজ্ঞাদান, অষ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবরদান প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে আসেন।

এ বিহারে পূর্ণিমা তিথিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণভাবে বুদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান এবং বনভন্তের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। কঠিন চীবর দানের সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে, রং করে, কোমর তাঁতে বুনে, সেলাই করে চীবর তৈরি করা হয়। এই দৃশ্য খুবই

চমৎকার। চাকমা রাজমাতা বা চাকমা রানি দিনের শুরুরে সূতা কাটা উদ্বোধন করেন এবং দিনের শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা প্রদানের পর চাকমা রাজা তৈরিকৃত চীবর দান করেন। এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন বিহারটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। বনভন্তে এবং রাজবন বিহারের খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণ রাজবন বিহার দর্শন করতে আসেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে এই বিহারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

রাজবন বিহার অঙ্গনে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।  
কঠিন চীবরদানের সময় রাজবন বিহারে কীভাবে চীবর তৈরি করা হয় তা বর্ণনা করো।

### পাঠ : ৬

#### দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল ও সংরক্ষণ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল অনেক। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মন উদার হয়। দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুভূতির বিকাশ ঘটে। দর্শনীয় স্থান ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি হয়। দেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় প্রেরণা জাগে। তাই সময় পেলে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এবং শিক্ষকের সঙ্গে দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত।

দর্শনীয় স্থানসমূহ জাতীয় সম্পদ। এগুলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখে। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পর্যটনশিল্প হিসেবে রাজস্ব আয় করে। তাই দর্শনীয় স্থানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

বিভিন্ন কারণে দর্শনীয় স্থানসমূহ ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। যেমন: সংরক্ষণের অভাব, অযত্ন, নদীভাঙন, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, তুফান, পশু-পাখির মল ত্যাগ, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, অপ্রয়োজনীয় লতা-পাতা, গাছ পালা জন্ম বা উদ্ভিদজাত সংক্রমণ, বায়ুদূষণ, অজ্ঞ মানুষের অহেতুক কৌতূহল, লুটেরাদের দৌরাভ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে দর্শনীয় স্থানগুলো ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। তাই ওপরে বর্ণিত কারণে যাতে দর্শনীয় স্থানগুলোর ক্ষতি না হয়, সে জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। দর্শনীয় স্থানের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। দেখাশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ-জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য সর্ব-সাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা থাকা দরকার।

#### অনুশীলনমূলক কাজ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফলগুলো লেখো।  
দর্শনীয় স্থান ধ্বংসের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করো।  
দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করো।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সোমপুর মহাবিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য কয়টি কক্ষ ছিল?

- ক. ১১০                      খ. ১১৫  
গ. ১৬৮                      ঘ. ১৭৭

২. ময়নামতি বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো-

- ক. বৌদ্ধ নির্দেশন আবিষ্কার  
খ. শালবন মহাবিহারের সৌন্দর্য  
গ. তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতি  
ঘ. ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কল্যাণ মিত্র চৌধুরী প্রথমে পার্বতাপুত্রের একটি বিহার দর্শনের জন্য যান। বিহারটির নির্মাণশৈলী তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি আরও মুগ্ধ হন উক্ত বিহারের পাঠাগার, বোধিবৃক্ষ, বয়নশালা ও উপাসনালয় দেখে। তিনি আরও জানতে পারেন, উক্ত বিহারটি বৌদ্ধদের নিকট পুণ্যতীর্থ হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয়বার তিনি দেব বংশের রাজপুত্র ভবদেবের নির্মিত একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান।

৩. কল্যাণ মিত্র চৌধুরীর দর্শনীয় বিহারটির সাথে কোন বিহারের সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. আনন্দ বিহার                      খ. মৈত্রী বিহার  
গ. রাজবন বিহার                      ঘ. রামকোট বিহার

৪. দ্বিতীয়বারে দেখা বিহারটির -

- i. মূল অংশ ক্রুশ আকৃতির  
ii. এক পাশে পূজার জন্য কক্ষ রয়েছে  
iii. বিদ্যাপীঠ হিসেবে অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিলো

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii                                      খ. i ও iii  
গ. ii ও iii                                      ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জ্ঞানাকুর বৌদ্ধবিহারের উপাসক উপাসিকাগণ ধর্মীয়ভাবে ঐতিহাসিক একটি বিহার দেখতে যান। তারা জানতে পারেন, বিহারে ১১৫ টি কক্ষ, মন্দির, পূজাকক্ষ এবং বুদ্ধমূর্তিসহ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পাওয়া গেছে। এখানে ধর্মচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন।

উপাসক উপাসিকাগণ আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিহার ভ্রমণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু 'বনভাস্তে' এই বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তারা জানতে পারেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থাপত্যের এই বিহার তীর্থস্থান হিসেবেও বিখ্যাত। এখানে ভিক্ষুশালা, মন্দির, সপ্তস্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি রয়েছে।

ক. ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?

খ. দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত কেন?

গ. উদ্দীপকের উপাসক উপাসিকাগণ প্রথমে কোন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দ্বিতীয় স্থানটি ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-দোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

## ২. দৃশ্যকল্প -১:

দিলীপ মুৎসুদ্দি স্বদেশে ফিরে এসে রাঙামাটি বৌদ্ধবিহারে অষ্টপরিষ্কার দান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বিহারে উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে দানকার্য সম্পাদন করেন। তিনি ঘুরে উক্ত বিহারে বয়নমালা, ভজনালয়, ভিক্ষু উপগুপ্তের মূর্তি, সপ্তস্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি দর্শন করেন।

## দৃশ্যকল্প -২:

স্ট্রীকে সঙ্গে নিয়ে নীতিময় চাকমা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যান। তারা কক্সবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু'মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি বিহারে যান। বিহারটি ছোট ছোট অনেকগুলো পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এটির সৌন্দর্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর।

ক. পাহাড়পুর কোথায় অবস্থিত?

খ. দর্শনীয় স্থানগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

গ. দৃশ্যকল্প -১ এর সাথে কোন বিহারটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প -২ এ যে বিহারের উল্লেখ রয়েছে সেটির প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ করো।

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শালবন মহাবিহারে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি ও ধ্বংসাবশেষ থেকে কী কী ধারণা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

২. রামকোট বিহারের শিলালিপি সম্পর্কে লেখো।

৩. বনভাস্তে কে ছিলেন? বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে তিনি কী করেছেন?

৪. কঠিন চীবরদানের সময় কোথায় চীবর তৈরি করা হয়? কীভাবে? লেখো।

৫. দর্শনীয় স্থানগুলো কেন? ধ্বংস হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো।

## একাদশ অধ্যায়

# বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছোট ছোট ষোলোটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজ্যের রাজারা ছিলেন অনেক ক্ষমতাধর। রাজার ইচ্ছাতেই রাজ্যের সব কাজ পরিচালিত হতো। এ রাজাদের অনেকের সাথে গৌতম বুদ্ধের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। এ সময় অনেক রাজা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ গ্রহণ করে রাজ্যে অপ্রয়োজনে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি পূজা বা যজ্ঞের নামেও পশু হত্যা অনেক রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। জনকল্যাণে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে বুদ্ধ রাজাদের উপদেশ দিতেন। অনেক রাজা বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক ছিলেন।

এ রাজাদের অনেকেই গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার ও প্রসারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি রাজন্যবর্গের অবদান নামে স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মগধের রাজা বিম্বিসার। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধাচিহ্নে স্মরণযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে পড়ব। এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- \* রাজা বিম্বিসারের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- \* বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বিম্বিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ : ১

### রাজা বিম্বিসার

বিম্বিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে যে ষোলটি জনপদ বা রাজ্যের কথা জানা যায়, তার মধ্যে মগধ খুবই শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বর্তমানকালের ভারতের বিহার রাজ্যই ছিল মগধ রাজ্য। এই রাজ্যের মাটি উর্বর ছিল এবং প্রচুর ফসল হতো। এ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিরণ্যবতী বা শোন নদী।

বিম্বিসার ছিলেন হর্ষঙ্ক বংশের খ্যাতিমান নৃপতি। তাঁর নামের সাথে ‘শৈণিয়’ বা ‘শ্রেণিক’ বিশেষণ যুক্ত হয়ে তিনি ‘মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার’ নামে খ্যাত ছিলেন। এটি ছিল তাঁর বংশের উপাধি বিশেষ। রাজা বিম্বিসারের রাজ্যাভিষেকের সঠিক সময় জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের আনুমানিক ষাট বছর আগে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বিম্বিসারের রাজত্বকাল থেকেই মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।

### বিম্বিসারের জীবনকথা

বিম্বিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। অঙ্গরাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত একদা বিম্বিসারের পিতা রাজা মহাপদ্মকে পরাজিত করেছিলেন। বিম্বিসার পনেরো বছর বয়সে রাজা হন। রাজা হয়ে তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গরাজ্য দখল করে নেন। তার পর থেকে মগধ রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রাজা বিম্বিসার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর সৈন্যবাহিনী খুব পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে তিনি হাতি ব্যবহার করতেন। ফলে তিনি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জানা যায়, তাঁর রাজ্যে আশি হাজার শহর ছিল। শহরগুলোর মধ্যে তিনি সুন্দর যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কোশল রাজ্যের রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি কোশল, বৈশালী, গান্ধার, অবন্তী প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজা বিম্বিসার প্রাচীন রাজগৃহ নগরী নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানে ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিক পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাজগৃহে বুদ্ধ অনেক দিন বসবাস করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এখানে প্রথম ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল। এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। রাজগৃহের নিকটেই অবস্থিত ছিল নালন্দা।

রাজা বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময় প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বিম্বিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। পরে দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতৃবিরোধী হয়ে ওঠেন। একসময় তিনি পিতাকে কারাবদ্ধ করেন। তাঁকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেন। বিম্বিসার কাগাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর।

রাজা বিম্বিসার অন্য রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শান্তিপ্ৰিয় রাজা ও উত্তম সংগঠক। পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের রাজারাও তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধারের রাজা পুক্কুরসতি তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করেছিলেন। জীবক ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক।

রাজা বিম্বিসারের রাজ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই সমসাময়িককালে বিকাশ লাভ করেছিল। মহাবীর জৈন, গৌতমবুদ্ধ এবং রাজা বিম্বিসার প্রায় সমকালীন ব্যক্তিত্ব। রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও জৈনধর্মসহ সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিয়মিত রাজ্য পরিদর্শন করতেন। গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন। কথিত আছে, তিনি আশি হাজার গ্রামিকের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের রাস্তা ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বিম্বিসারের জীবন কাহিনি লেখো।

## পাঠ : ২

### বুদ্ধ ও রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধত্ব লাভের আগেই রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বোধিজ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে প্রথমে তিনি অনুপ্রিয় নামক আমবাগানে পৌঁছান। সেখানে তিনি মস্তক মুগুন করেন। তারপর কাষায় বস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন। এ সময় তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। পায়ে হেঁটে তিনি এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যেতেন। এভাবে তিনি বৈশালী থেকে রাজগৃহে পৌঁছান। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সৌম্য-শান্ত অপূর্ব সুন্দর এক যুবক ভিক্ষা করছেন। রাজগৃহের নগররক্ষীরা তাঁকে দেখে অবাক হন। এ খবর তারা পৌঁছে দেন রাজা বিম্বিসারের কাছে। রাজ প্রাসাদ থেকেই রাজা বিম্বিসার তাঁকে দেখতে পান। রাজা নিজে এসে তাঁর সাথে দেখা করে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। রাজা তাঁকে এই কঠিন ব্রত ছেড়ে রাজসুখ ভোগ করার আহ্বান জানান। সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তখন সিদ্ধার্থ রাজা বিম্বিসারকে বলেন, ‘মহারাজ! আমি সুখপ্রার্থী নই। আমি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছি।’ রাজা বলেন, ‘বৎস! আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার উদ্দেশ্য জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমাকে একবার দর্শন দেবেন। আমি আপনার সেবা করব, আপনাকে বন্দনা করব।’ রাজা বিম্বিসারের কথায় সিদ্ধার্থ সম্মতি প্রদান করে সেখান থেকে বের হয়ে যান।

রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের আবার দেখা হয় বুদ্ধত্ব লাভের পর। তখন বুদ্ধ রাজগৃহের লট্ঠি বন উদ্যানে বসবাস করছিলেন। তার দুই বছর আগেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। লোকমুখে তাঁর যশ-খ্যাতির কথা শুনে রাজা বিম্বিসার তাঁর সাথে দেখা করেন। বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের কাছে নতুন ধর্মের বাণী শোনার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল ও স্বর্গ সম্বন্ধে সরলভাবে ধর্মোপদেশ দান করেন। তারপর, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন।

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক হন। এ সময় রাজা বিম্বিসারের বয়স হয়েছিল ঊনত্রিশ বছর। সে সময় রাজা বিম্বিসার ভিক্ষুসংখসহ বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে নানা ধর্মকথা শোনান। রাজা ধর্মকথা শুনে আনন্দচিত্তে বুদ্ধকে বললেন, 'প্রভু! ছোটকালে আমার পাঁচটি কামনা ছিল। তা আজ পূর্ণ হলো।' কামনাগুলো হলো:

১. আমি ভবিষ্যতে রাজপদে অভিষিক্ত হব।
২. আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন।
৩. আমি সেই বুদ্ধকে সেবা ও পরিচর্যা করব।
৪. সেই ভগবান বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপদেশ দান করবেন।
৫. আমি বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করব।

তারপর রাজা বিম্বিসার অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর রাজ্যের অতি মনোরম বেনুবন উদ্যান বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষুসংখকে দান করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের কখন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ হয়?  
রাজা বিম্বিসারের কামনাগুলো লেখো। (দলীয় কাজ)

### পাঠ : ৩

## বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিম্বিসারের অবদান

বুদ্ধের উপাসক হওয়ার পর থেকে রাজা বিম্বিসার নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করতে থাকেন। তিনি ছত্রিশ বছর বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সেবা করেন। তিনি মগধের অধিবাসীদের ধর্ম দেশনা করার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধে মগধবাসীর উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। সেই সময় থেকে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক গৃহীদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে সমবেতভাবে ধর্ম আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদের নিকট ধর্মকথা শুনতেন। তাঁদের ধর্মে দীক্ষা নিতেন। রাজা বিম্বিসার এসব লক্ষ্য করে ভিক্ষুদেরও ঐ সব তিথিতে ধর্ম আলোচনার সুযোগ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথ পালন ও ধর্ম আলোচনার নির্দেশ দেন। রাজা বিম্বিসারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। তিনি খুবই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন।

ভিক্ষুরা আগে পুরাতন ও পরিত্যক্ত কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে সেলাই করে পরিধান করতেন। এতে ভিক্ষুদের অনেক রকম রোগ হতো। চিকিৎসক জীবক ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন এবং নতুন কাপড় পরিধানের অনুমতি প্রদানের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ জীবকের আবেদন মঞ্জুর করে ভিক্ষুদের নতুন কাপড় পরিধানের বিধান দিয়েছিলেন। এর পর থেকে রাজা বিম্বিসারও ভিক্ষুদের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কাপড় দান করতেন। এভাবে রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।

অনুশীলনমূলক কাজ  
বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে কী কী অনুরোধ করেছিলেন?

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবক কোন রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন?

- ক. শুদ্ধোদন
- খ. অশোক
- গ. বিম্বিসার
- ঘ. অজাতশত্রু

২. রাজা বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন, কারণ তিনি-

- i. প্রজা বাৎসল ছিলেন
- ii. ন্যায় নীতির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতেন
- iii. যুদ্ধ বিদ্যা ও কৌশলে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কানাইমাদারী গ্রামের উপাসিকা পুষ্পারাণী নিজ গ্রামে একটি বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটি তিনি ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উপলক্ষে ঐ গ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শ্রদ্ধেয় ভক্ত দেশনাকালে ঐতিহাসিক বেনুবন উদ্যান দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এর প্রভাব ব্যাখ্যা করেন।

৩. পুষ্পারাণী বড়ুয়ার কর্মে রাজা বিম্বিসারের কোন চেতনা প্রেরণ জুগিয়েছে?

- ক. শ্রদ্ধা
- খ. আন্তরিকতা
- গ. সেবা কর্ম
- ঘ. খ্যাতি লাভ

৪. পুষ্পারাণীর উদ্যোগ-

- i. বৌদ্ধ ধর্ম উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে
- ii. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জ্ঞান লাভের সুযোগ তৈরি করবে
- iii. বিদ্যাপীঠ হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

১. গৌতম বুদ্ধের সময়কালে এমন একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিলো যে রাজ্যের ১৫ বছর বয়সী রাজার প্রতাপ এবং পারদর্শীতায় উক্ত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সুশাসক এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসেবে তিনি প্রজাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছিলেন।

রাজা তার রাজত্বকালে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং বহু রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যের পরিধি বিস্তার করেন।

ক. বুদ্ধের সঙ্গে রাজা বিম্বিসারের কখন সাক্ষাৎ হয়?

খ. দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে কোন রাজার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনকল্যান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে উদ্দীপকের রাজার ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. চিকিৎসক বুদ্ধকে ভিক্ষুদের জন্য নতুন কাপড় পরিধানের অনুমতি চাইলেন কেন?

২. রাজা বিম্বিসার কীভাবে বুদ্ধের অনুরাগী হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. রাজা বিম্বিসারের সময়ে কোন ২টি ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে? লেখো।

৪. প্রথম বার দেখা হওয়ার কত বছর পর, কোথায় বুদ্ধের সাথে রাজা বিম্বিসারের দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল?

৫. বুদ্ধের নিকট রাজার দুইটি কামনা লেখো।

**সমাপ্ত**

# ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি : বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল প্রাণী সুখী হোক ।  
- গৌতম বুদ্ধ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।